হুমায়ূনের সমাধি।

সিমলার সাবেক পথ।

ও অতি চমৎকার, ইহারও অভ্যন্তর শ্বেতপ্রস্তরমণ্ডিত। তাজমহলের ন্যায় এই সমাধিমন্দির একটী সুন্দর বাগানের মধ্যস্থলে স্থাপিত।

১৮৯১ সালে দিল্লী নগরের নিবাসী সংখ্যা ১৯৩,০০০ ছিল। পাঞ্জাবে এত বড় নগর আর নাই। যমুনায় লোহার সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার উপর দিয়া ইষ্টইণ্ডিয়া রেল-পথ দিল্লীতে গিয়াছে। আরও কএকটী রেলওয়ে আসিয়াও দিল্লীতে যুটিয়াছে। সোণা, রূপার ও গিল্টির তার দিয়া এখানে অতি উৎকৃষ্ট অলঙ্কার প্রস্তুত হয়। মোগল সাম্রাজ্য উঠিয়া যাওয়াতে এই ব্যবসায়ের নিতান্ত অবনতি হইয়াছে; তথাপি স্থূলতঃ নগরের সমৃদ্ধি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে।

পাঞ্জাব ভ্রমণ।

পাণিপথ দিল্লী হইতে অনুমান ৩০ ক্রোশ উত্তরে; এ স্থানটী বহুকালের। কথিত আছে, পাণ্ডবেরা কৃষ্ণের দ্বারায় দুর্য্যোধনের নিকট সন্ধি প্রার্থনায় যে পাঁচটী প্রস্থ চাহেন, পাণিপথ তাহার একটী। সে কালের কথা থাকুক, এ কালের মধ্যে পাণিপথের প্রকাণ্ড প্রান্তরে তিন বার সাংঘাতিক সংগ্রামের পর, ভারতের উচ্চতর প্রদেশের ভাগ্যনিরূপিত হইয়াছে।

থানেশ্বর।—পাণিপথ হইতে উত্তর পশ্চিম দিকে দ্বাদশ ক্রোশের পথ। এই স্থানটী সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী। এটী ভারতের অতি পুরাতন নগর, মহাভারতের আখ্যায়িকার সহিত এ নগরের সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, যে কুরুক্ষেত্রে ভারত বীরশূন্য হইয়াছিল, তাহা এই নগরের নিকটবর্ত্তী। ১০০১ সালে মহম্মদ গজনি এই নগর দখল ও অতি নিষ্ঠুর রূপে লুঠ পাট করেন। এখানে একটী তড়াগ আছে। ভারতের নানা দেশ হইতে অনেক যাত্রি তাহাতে গিয়া স্নান করে। কথিত

সিমলা।

আছে যে, গ্রহণ কালে ভারতের সমস্ত পবিত্র কুণ্ড ও নদীর জল এই তড়াগে আসিয়া জমা হয়, সুতরাং এখানে স্নান করিলে, সর্ব্বতীর্থে স্নানের ফললাভ হয়।

অম্বালা নগরে অনেক গোরা এবং দেশী পল্টন আছে। এই নগর দিল্লী হইতে রেল পথে ৬৮ ক্রোশ। ১৮২৩ সালে এই নগর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হয়। সিমলাগামী লোকেরা প্রায়ই এই স্থান হইতে পাহাড়ের পথে যাইত। এক্ষণে দিল্লী হইয়া রেলপথে কাল্কা যাইতে হয়। কাল্কা বা কালিকা পাহাড়ের গোড়ায়। এখানে না কি ৫২ পীঠের এক পীঠ পড়িয়াছিল; এখানে কালিকা নামে দেবীর মন্দির আছে।

সিমলা পাহাড়ে আমাদের বড় লাট, জঙ্গি লাট, এবং পাঞ্জাবের ছোট লাট গ্রীষ্মকালে বাস করেন। ইহাঁদের অনেক ছোট বড় কর্ম্মচারী সঙ্গে গিয়া থাকেন। কাল্কা হইতে সাবেক পথে সিমলা ২০ ক্রোশ; কিন্তু পথ এমন খাড়া যে ডুলি বা ঘোড়া নহিলে যাওয়া যায় না। নূতন রাস্তার দৈর্ঘ্য ২৮ ক্রোশ, এক প্রকার দুই ঘোড়ার গাড়িতে যাওয়া যায়, এই গাড়িকে টঙ্গা কহে।

১৮১৯ সালে এক জন ব্রিটিশ সৈনিক পুরুষ সর্ব্বপ্রথমে সিমলা পাহাড়ে গিয়া তক্তা দিয়া এক খানি কুটীর নির্ম্মাণ করেন। তাহার পরে আরো অনেকে যান। ১৮২৭ সালে লর্ড আমহার্ষ্ট এই পাহাড়ে গ্রীষ্মকাল যাপন করেন। লর্ড লরেন্সের শাসনকাল (১৮৬৪) হইতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই খানে গ্রীষ্মকাল যাপন করিতেছেন। এখানকার বড় লাটের নূতন বাড়ী বড় চমৎকার।

সমুদ্র হইতে সিমলা পাহাড় ৪৬০০ হাত উচ্চ। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে এস্থান বড় ভিজা ও কুয়াশাময়। সিমলার উচ্চ শিখর হইতে বহু দূরবর্ত্তী চিরনিহারমণ্ডিত রজতগিরির যে টুকু দেখা যায়, তাহা বড় চমৎকার নহে, কিন্তু একটু দূরবর্ত্তী পর্ব্বতশিখর হইতে রজতগিরির বড় চমৎকার দৃশ্য দৃষ্ট হয়।

সিমলা হইতে পুনরায় অম্বালায় আসিয়া, চল, রেল পথে উত্তর পশ্চিম দিকে যাওয়া যাউক। প্রথম বিশেষ

স্থান লুধিয়ানা; এই নগর শতদ্রু নদীতীরে স্থাপিত। এখানকার তৈয়ারি শাল অতি বিখ্যাত। প্রথম শিখ যুদ্ধের পূর্ব্বে, এইটী ভারত গবর্ণমেণ্টের সীমানাস্থ নগর ছিল। এই নগরের নিকটস্থ স্থানে শিখ ও ইংরাজে তুমুল যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। লুধিয়ানা ছাড়াইয়া ১৬ ক্রোশ দূরে জলন্দর, এখানে পণ্টন থাকে। আবার জলন্দর হইতে ২৬ ক্রোশ দূরে শিখদিগের পুণ্য নগর অমৃতসর।

শিখ জাতি।

ইংরাজদিগের পূর্ব্বে শিখ জাতি পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা ছিল। এই বীরপ্রকৃতি জাতির বিবরণ সংক্ষেপে লিখিতেছি।

শিখ শব্দ শিষ্য শব্দের অপভ্রংশ। আপনাদিগকে শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে শিখ জাতির গুরুভক্তি প্রকাশ পায়।

১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে শিখ জাতির স্থাপনকর্ত্তা নানকের জন্ম হয়। ইতিপূর্ব্বে কবির নামে এক জন হিন্দু ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন। নানক সাহেবের ধর্ম্মশিক্ষার মূল অনেক পরিমাণে কবিরের ধর্ম্মমত। এক ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপনদ্বারা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করাই নানকের শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু নানকের প্রতীতিবাক্য একেশ্বরবাদ নহে, অদ্বৈতবাদ, অর্থাৎ সকলই ঈশ্বর। তিনি শিক্ষা দিতেন যে, কেবল হরিনাম জপই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়।

নানক বিলক্ষণ দেশভ্রমণ করেন। কথিত আছে যে, তিনি পক্ষির ন্যায় আকাশপথে উড়িতে পারিতেন। এবং কোন স্থানে যাইবার ইচ্ছা না থাকিলে সেই স্থানটী আপনার নিকটে আনাইতেন। তিনি এক বার মক্কায় গমন করিয়াছিলেন। এক দিন তিনি কাবা সরিপের দিকে পা করিয়া শুইয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ ভৎসনা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, তবে যে দিকে পা করিয়া শোও না কেন, দোষ হইবে, কারণ ঈশ্বর ত সকল স্থানেই আছেন।

সত্তর বৎসর বয়সে, ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নানক পরলোকপ্রাপ্ত হয়েন। দশম গুরু গোবিন্দের যত্নে শিখেরা যুদ্ধপ্রিয় জাতি হইয়া উঠে। তিনি জাতিভেদ উঠাইয়া দেন, শিষ্যদিগের নামের পরে "সিংহ" উপাধি ধারণের ব্যবস্থা করেন; তাঁহার আজ্ঞানুসারে শিখেরা দীর্ঘ কেশ রাখে, ও ছোট খাট পা-জামা পরে। তাঁহারই শিক্ষা অনুসারে শিখেরা সর্ব্বদা তরবারি সঙ্গে রাখিত। গোবিন্দ সর্ব্বদাই যুদ্ধে ব্যস্ত থাকিতেন, অবশেষে কেহ তাঁহাকে গোপনে বধ করে। পাটনাতে তাঁহার নামে উৎকৃষ্ট একটী মন্দির আছে। আপনার মৃত্যুর পর কাহাকেও গুরুপদে নিযুক্ত করিতে নিষেধ করিয়া গোবিন্দ এই আজ্ঞা করেন, "আমার মৃত্যুর পরে তোমরা যেখানে থাক না কেন, এই গ্রন্থ সাহেবকে মানিয়া চলিও; যাহা জানিতে চাহ, এই গ্রন্থে তাহা পাইবে।" ইহারা আপনাদের ধর্ম্ম পুস্তককে "গ্রন্থ সাহেব" বলে। কএক বৎসর হইল, অধ্যাপক ট্রুম্প নামক এক জন পণ্ডিত শিখদিগের "আদি গ্রন্থ" ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহা "অতিশয় অসংলগ্ন ও বিরক্তিকর পুস্তক, ইহাতে যে কএকটী ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, গ্রন্থের নানা স্থানে নানা ভাবে তাহার চর্ব্বিতচর্ব্বন হইয়াছে। অন্যূন ৩৫ জন লোকের রচিত পদ্যময় শিক্ষা বা উপদেশ বিশৃঙ্খল ভাবে একত্র সংগৃহীত হইয়াছে; ঐ ৩৫ জনের ১৫ জন ব্যবসাদার কবি, গুরুদিগের প্রশংসা পদ্যে রচনা করণার্থ তাহারা নিযুক্ত ছিল।"

আপনাদিগের ধর্ম্মে প্রতিমার পূজা নিষিদ্ধ বলিয়া শিখেরা গৌরব করে, অথচ আপনাদের ধর্ম্মগ্রন্থের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতঃ তাহাকে কাপড় পরায়, নানাপ্রকারে সাজায়, বাতাস করে, রাত্রে বিছানায় শুয়াইয়া রাখে, এবং হিন্দুরা যেমন শালগ্রামের পূজা করে, তেমনি তাহার পূজা করিয়া থাকে।

এক্ষণে শিখেরা জাতিভেদ মানে, এবং অনেক বিষয়ে হিন্দু আচার ব্যবহারের অনুকরণ করে। কুসংস্কার বিষয়ে ইহারা অনেক স্থলে হিন্দুদিগের অপেক্ষা এক কাটি বাড়া। ইহাদের মতে গাভী দেবতাবিশেষ। এক সময়ে পাঞ্জাবে কন্যাহত্যা অপেক্ষা গোহত্যা অধিকতর দোষ বলিয়া গণ্য ও হত্যাকারির প্রাণদণ্ড হইত। মুসলমানদের সহিত শত্রুতাই ইহার মূল; কারণ কোন জিলা দখল করিলে মুসলমানেরা জয়চিহ্নস্বরূপ গোহত্যা করিত; এবং তদ্দ্বারা হিন্দুদিগের প্রতি আপনাদের বিদ্বেষ ভাবের পরিচয় দিত। আবার সুযোগমতে শিখেরা মস্‌জিদে শূকর হত্যা করিত। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একতা স্থাপনই নানকের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু শেষে হিতে বিপরীত হইয়াছে।

শিখেদের মদ্যপান করিবার বিধি আছে, কিন্তু তামাক খাওয়া নিষিদ্ধ। তামাক খাইলে সমস্ত পুণ্য কর্ম্ম মাটী।

এক দল শিখ উদাসীন আছে, তাহাদিগকে অকালি বলে, তাহারা স্বয়ম্ভূ ঈশ্বরের উপাসক। তাহাদের পাগড়ী চূড়ার মতন, তাহার চারি দিগে ইস্পাতের চক্র আছে, সেগুলি যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ, শিখধর্ম্মবিরোধিদিগের প্রাণ-বধ করা ইহাদের মতে অতি পুণ্য কর্ম্ম।

শিখ ধর্ম্মাবলম্বির সংখ্যা প্রায় ১৮ লক্ষ। ভারতবর্ষের আর কোথায়ও এমন সাহসী শত্রুর সঙ্গে ইংরাজদিগকে যুদ্ধ করিতে হয় নাই, কিন্তু এক্ষণে শিখেরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অতি বিশ্বস্ত প্রজা। ১৮৫৭ সালের সিপাহিবিদ্রোহ কালে শিখেরা ইংরাজদের বড় উপকার করিয়াছিল।

অমৃতসর।

অমৃতসরের মতন বড় নগর আর পাঞ্জাবে নাই। রাবি ও বিতস্তা নদীর মধ্য স্থলে এই নগর। শিখদিগের চতুর্থ গুরু রামদাস অমৃতসর নগরের পত্তন করেন, সম্রাট আকবর তাঁহাকে নগর নির্ম্মাণার্থ ভূমি দান করিয়াছিলেন। যে পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে মন্দির স্থাপিত, রামদাসই তাহা খনন করান। ইহার নাম "অমৃতসর," এই নামানুসারে নগরের নাম অমৃতসর হইয়াছে। তাঁহারই দ্বারা মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য আরব্ধ হয়। কিন্তু তৎপুত্র নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করেন। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে আফগান আমেদ শাহ সম্পূর্ণরূপে শিখদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেন। তিনি অমৃতসর নগর ছারখার করেন, বারুদ দিয়া মন্দিরটী উড়াইয়া দেন, পবিত্র পুষ্করিণী মাটী দিয়া ভরাট
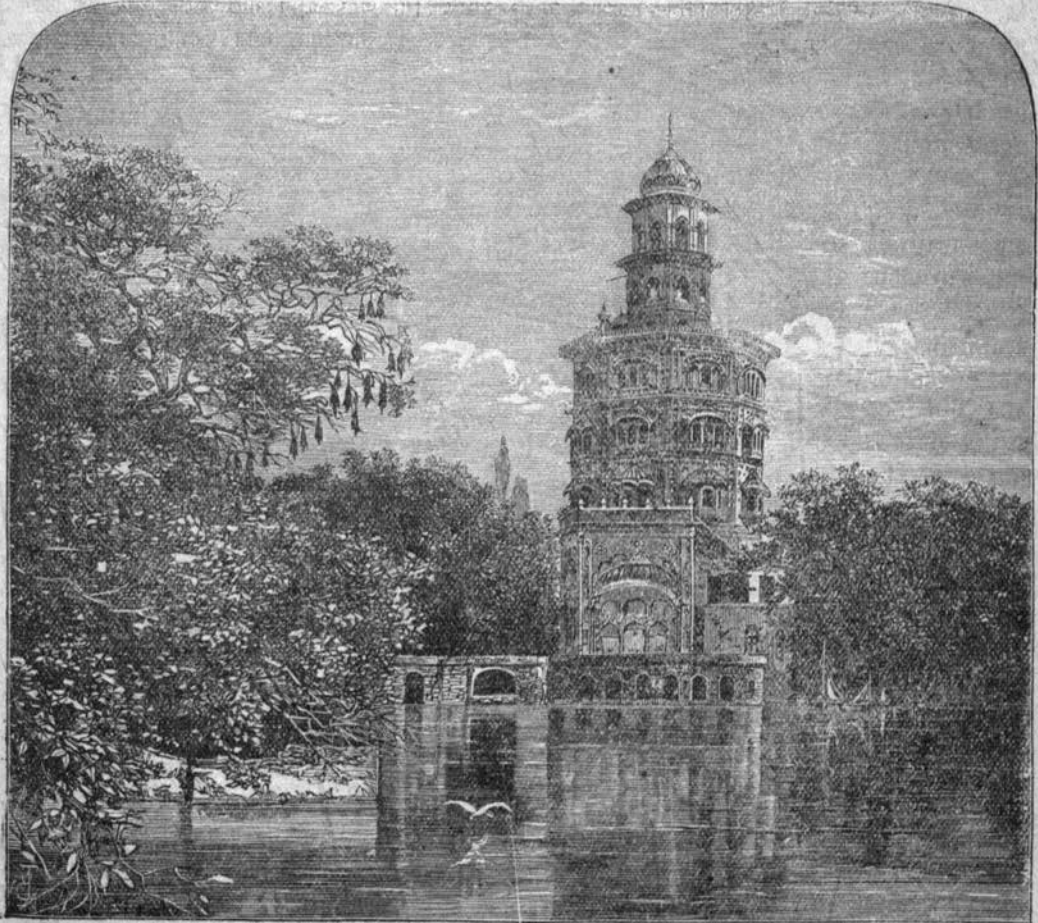
অটল বাবার সমাধি মন্দির।

করেন, এবং গোহত্যা করিয়া পবিত্র স্থান অপবিত্র করেন। কিছু দিন পরে উক্ত মন্দির পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০২ সালে রঞ্জিত সিংহ অমৃতসরনগর দখল করেন। তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করত মন্দিরটীর সংস্কার করেন, এবং গিল্টী করা তামার পাত দিয়া ছাত মুড়িয়া দেন, সেই জন্য মন্দিরের নাম হইয়াছে "স্বর্ণ মন্দির।" নগরের বহির্ভাগে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তিনি তাহার নাম গোবিন্দ-গড় রাখেন। তাজমহলের ন্যায়, এই

মন্দিরের নিম্নভাগ শ্বেতপ্রস্তর দ্বারা মণ্ডিত, মধ্যে মধ্যে বহুমূল্য প্রস্তরখণ্ডও আছে। কোন কোন স্থান স্বর্ণমণ্ডিত। নিম্নতলে একটী গোলাকার কক্ষ আছে, তাহার ছাদ গিল্টী করা, আবার অসংখ্য আর্শী দিয়া সাজান; এবং দেওয়ালে নানা প্রকার কারুকার্য্য। প্রধান দ্বারের সম্মুখে, মধ্যভাগে, গ্রন্থ খুলিয়া প্রধান গুরু বসিয়া থাকেন। প্রধান গুরু স্বয়ং বা তাঁহার সহকারীরা সুর করিয়া গ্রন্থ পাঠ করেন, তৎসঙ্গে নানা বাদ্য যন্ত্র বাজিতে থাকে। উপাসকেরা স্ত্রী হউক বা পুরুষ হউক, এই দ্বার দিয়া প্রবেশ করত, প্রধান গুরু ও গ্রন্থসাহেবকে আপন আপন উপহার উৎসর্গ করিয়া থাকে।

অন্যান্য সে কেলে নগরের ন্যায় পথ ঘাট সচরাচর অতি সংকীর্ণ এবং বক্র। কিন্তু বিগত কএক বৎসরের মধ্যে পথ ঘাটের অনেক উন্নতি হইয়াছে। অমৃতসরের শাল অতি বিখ্যাত। কাশ্মীরী লোকে শাল প্রস্তুত করে। অমৃতসরে বাণিজ্য-বিনিময়ও মন্দ হয় না। আধুনিক অট্টালিকার মধ্যে সিকন্দরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের বাটীটী দেখিতে বড় চমৎকার।

লাহোর।

পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোর নগর অমৃতসর হইতে ১৬ ক্রোশ, এবং রাবি নদী হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ। এই নগরের অনেক বার অবস্থান্তর হইয়া গিয়াছে। তিন শত বৎসর কাল এই নগর মুসলমানদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিলে পর দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে গিজনির সুলতান সবক্তাজিন লাহোরের রাজা জয় পালকে যুদ্ধে পরাজিত করাতে উক্ত রাজা নিতান্ত আশাভঙ্গ হইয়া অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করেন। পরে লাহোর গিজনি রাজবংশের রাজধানী হয়। মোগল সম্রাটদিগের রাজত্ব কালেও,লাহোর ন্যূনাধিক পরিমাণে তাঁ-

লাহোর।
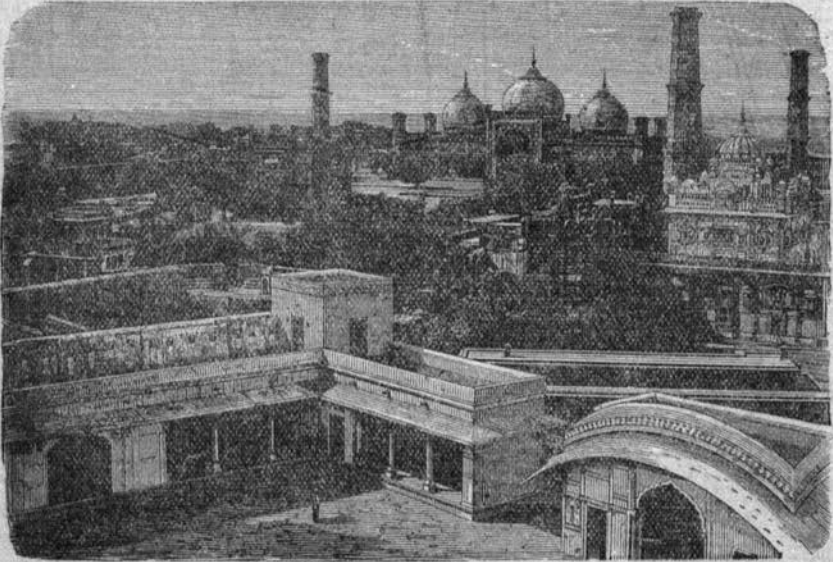
হাদিগের বাসস্থান ছিল। আকবর, জাহাঙ্গির, শাজাহান, এবং আরঙ্গ জিব, ইহাঁরা সকলেই নূতন নূতন অট্টালিকা দ্বারা লাহোর নগরের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। শেষে নানা জনে জয় করাতে মোগলনির্ম্মিত সমৃদ্ধিশালী লাহোর কালক্রমে কেবল ইঁট-পাথরের ঢিবি হইয়া পড়ে, কেবল এখানে সেখানে দুই একখানি বাড়ী ও ভগ্ন প্রাচীরের অভ্যন্তরে দুই একটী শিখ আমলের দুর্গ ছিল; প্রাচীরের বাহিরে বহুদূর ব্যাপিয়া ইঁট পাথর পড়িয়া ছিল; রাজধানীর চারি দিকে যে ছোট ছোট নগর ছিল, এ সকল তাহারই ভগ্নাবশেষ। রঞ্জিত সিংহের আমলে লাহোর নগরের অনেকটার পুনরুদ্ধার হয়। রঞ্জিত সিংহ মুসলমানদিগের সমাধি মন্দিরের সাজসজ্জা সকল খুলিয়া লইয়া গিয়া অমৃতসরস্থ মন্দির বিভূষিত করেন। শিখেরা যে সকল অট্টালিকার নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে রঞ্জিত সিংহের সমাধিমন্দিরই সর্ব্বপ্রধান। এই মন্দিরের গঠনপ্রণালিতে মুসলমানী ও হিন্দুয়ানী উভয় প্রীতিই পালিত হইয়াছে। মন্দিরের মধ্যে শিখদিগের একখণ্ড গ্রন্থ আছে, আর চারি দিকে ছোট ছোট মাটীর ঢিবি আছে, যে একাদশ জন রাণী রঞ্জিতের সহগমন করেন, উক্ত মাটীর ঢিবিতে তাঁহাদের ভস্ম প্রোথিত আছে।

নগরের রাস্তাগুলি সংকীর্ণ ও বক্র। উভয় পার্শ্বের বাটী সকল অত্যন্ত উচ্চ হওয়াতে চন্দ্র-সূর্য্যের মুখ বড় কষ্টে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মোগলদিগের নির্ম্মিত যে সকল চমৎকার অট্টালিকা আছে, তাহা দেখিলে
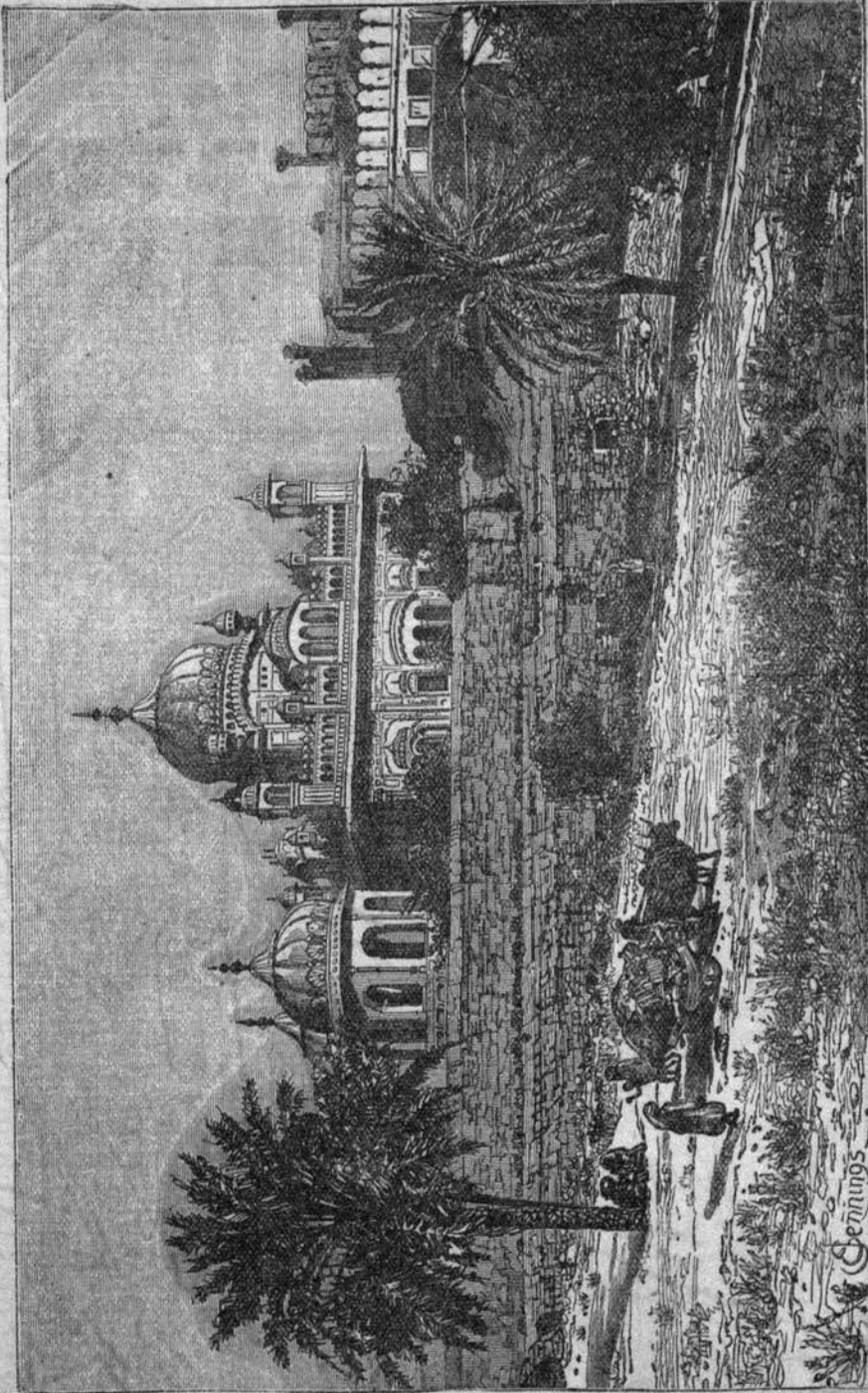
লাহোরের রাজবাটী ।

পথ ঘাটের অভাবজনিত কষ্ট ভুলিয়া যাওয়া যায়। ব্রিটিশ রাজত্বকালে যে সকল অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কলেজ বাটী, মেও হাসপাতাল, এবং রেলওয়ে ষ্টেশন সর্ব্বপ্রধান।

১৮৯১ সালে নগরের লোকসংখ্যা ১৭৭,০০০ ছিল। অমৃতসর অপেক্ষা কম।

লাহোর হইতে কএক ক্রোশ দূরে মিয়ান-মির, এখানে পল্টন থাকে।

কাংগ্রা।

পাঞ্জাব প্রদেশের উত্তর পশ্চিম দিকে কাংগ্রা নামে একটী জিলা আছে। সমভূমি হইতে আরব্ধ হইয়া, হিমালয় গিরিশ্রেণী অতিক্রম করিয়া তিব্বৎ পর্য্যন্ত এই জিলার সীমানা। বহুকাল পূর্ব্বে এই জিলা জলন্দরের
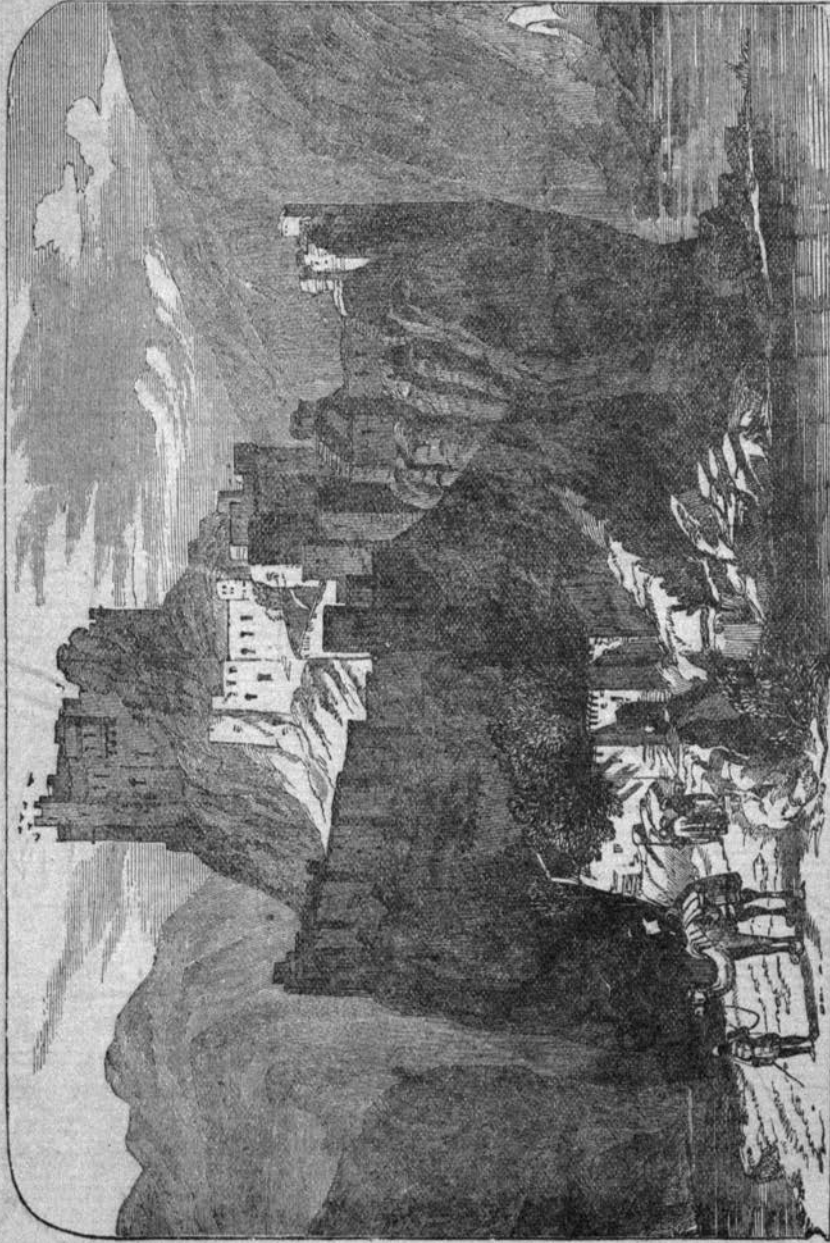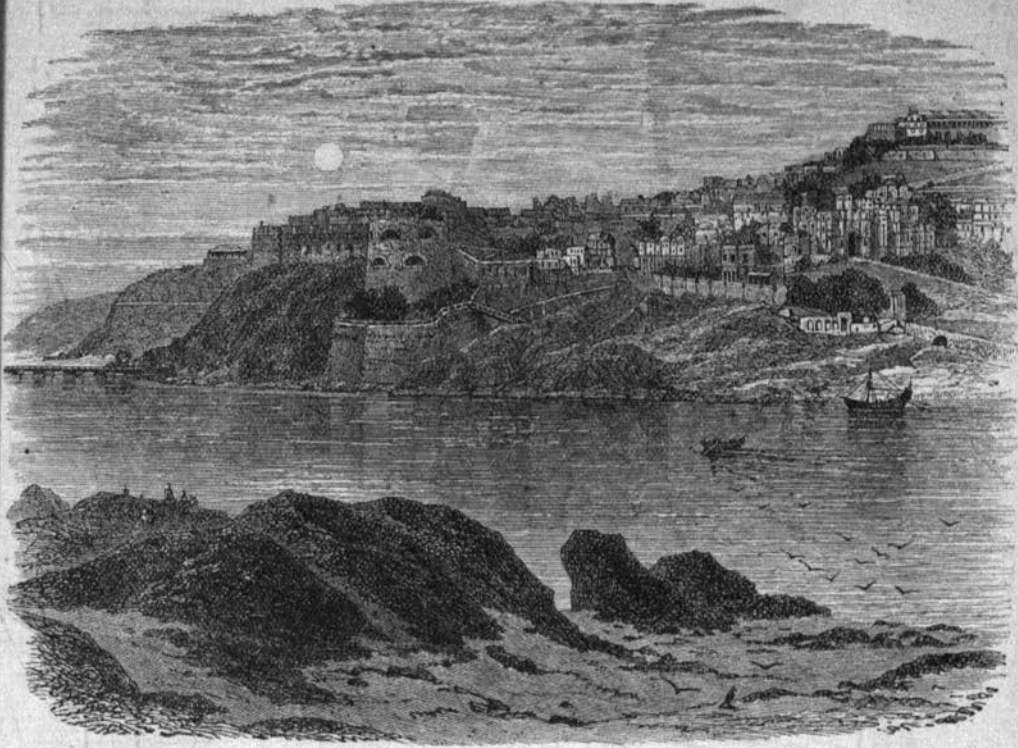
নগরকোটের দুর্গ।

সিন্ধুতীরস্থ আটকের দুর্গ।

রাজপুত রাজাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। উচ্চ একটী প্রস্তরময় গিরির চূড়াতে একটী দুর্গ আছে; এটী উক্ত রাজপুত রাজাদের প্রধান দুর্গ ছিল। ইহাতে নগরকোটের বিখ্যাত মন্দির ছিল।

১০০৯ সালে নগরকোটের মন্দিরস্থ ধনরাশির সংবাদ পাইয়া মহম্মদ গিজনি সসৈন্যে উক্ত দুর্গ আক্রমণ করিতে যাত্রা করেন। পেশোয়ারে হিন্দু রাজগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, কাংগ্রার দুর্গ আক্রমণ এবং মন্দির লুঠ করিয়া সোনা, রূপা ও মণিমুক্তাদি অগাধ ধন লইয়া যান। ইহার পঁইত্রিশ বৎসর পরে পর্ব্বতনিবাসীরা দলেবলে আক্রমণ করিয়া, মুসলমান সৈন্যগণকে পরাজিত করত, দুর্গটী পুনরায় অধিকার করে। মহম্মদ যে দেবমূর্ত্তি তুলিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, পরে তাহারা দিল্লীর রাজার সাহায্যে তাহার একটী অবিকল প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করে। ১৩৬০ সালে সম্রাট ফেরোজ তোগলক উক্ত দুর্গ আক্রমণার্থ যাত্রা করিলে রাজা পরাভব স্বীকার করেন। সম্রাট আর কিছু না করিয়া চলিয়া যান। কিন্তু মুসলমানেরা আর এক বার উক্ত মন্দির লুঠ করত দেবমূর্ত্তিটী মক্কায় পাঠাইয়া দেয়। সেখানে সেটীকে রাজপথে ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল। লোকে পদাঘাত করিয়া চলিয়া যাইত।

১৫৫৬ সালে আকবর স্বয়ং সসৈন্যে উক্ত দুর্গ আক্রমণ ও দখল করেন।

কাংগ্রা জিলায় আজকাল উত্তম চা জন্মে।

পেশোয়ার যাত্রা।

উত্তর ষ্টেট রেলপথ ১৩৯ ক্রোশ দীর্ঘ; এই রেলপথ দ্বারা লাহোর ও পেশোয়ার পরস্পর সংযুক্ত হইয়াছে। রাবলপিণ্ডি লাহোর হইতে ৮২ ক্রোশ, এখানে অনেক সৈন্য থাকে। এখান হইতে ২৯ ক্রোশ দূরে আটক নামক স্থানে সিন্ধু নদীর সেতু।

সিন্ধু নদ হাজারা হইতে একটী অপ্রশস্ত স্রোতে প্রবেশ করিয়া, অকস্মাৎ প্রায় এক ক্রোশ প্রশস্ত হইয়া, পড়িয়াছে; মধ্যে অনেক দ্বীপ বা চড়া; সেগুলি আবার নানা বৃক্ষে পরিপূর্ণ। আটক পর্য্যন্ত আসিয়া সম্মুখে
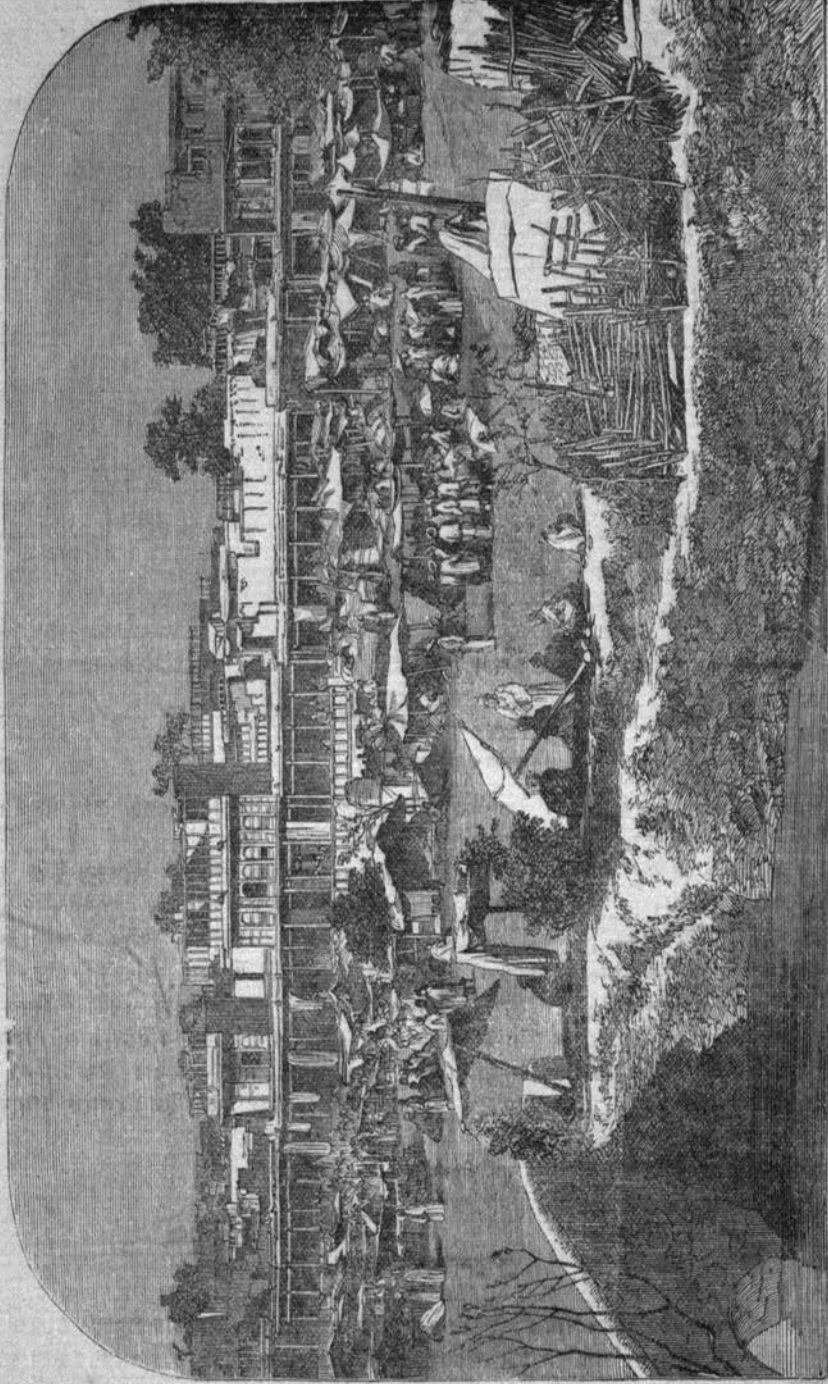
পেশোয়ার।

অনেক কৃষ্ণবর্ণ শৈল থাকাতে আবার সংকীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু খানিক দূর গিয়া আবার একটা প্রশস্ত নীলবর্ণ হ্রদে পরিণত হইয়া, পুনরায় মুখেদ পাহাড়ের প্রতিবন্ধকতাহেতু সংকীর্ণকায় হইয়াছে।

খায়িবর পাসের আলি-মসজিদ কেল্লা।

কাবুল নদী যে স্থলে আসিয়া সিন্ধু নদের সহিত মিলিত হইয়াছে, প্রায় তাহার বিপরীত দিকে আটকের দুগ; সম্রাট আকবর এইটী নির্ম্মাণ করেন। পর্ব্বতের এমন উচ্চ স্থানে নদীর তীরে এটী স্থাপিত যে দুর্গ হইতে

অনেক দূর দৃষ্টি করা যায়। কাবুল নদীর সঙ্গম স্থানের ভাটিতে কৃষ্ণবর্ণ শ্লেট পাথরের দুইটা টেঁকের মতন আছে, স্রোতোবেগ তাহাতে বাধা পাইয়া এক ভয়ানক পাক পড়িয়াছে। ঐ দুইটা পাথরের একটাকে কামালিয়া, অন্যটাকে জালালিয়া কহে, কথিত আছে যে, আকবরের রাজত্বকালে উক্ত নামধেয় দুই জন উদাসীনকে পর্ব্বতের চূড়া হইতে ঐ স্থানে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে রেলওয়ে পুল দিয়া সহজে নদী পার হওয়া যায়।

পেশোয়ার নগর আটক হইতে ২৩ ক্রোশ, একটী উপত্যকায় স্থিত। এই উপত্যকা দিয়া কাবুল নদী প্রবাহিত। উপত্যকার পশ্চিম প্রান্ত খায়িবর পাস নামে বিখ্যাত গিরিসঙ্কটের সহিত সংযুক্ত এবং পূর্ব্ব প্রান্ত সিন্ধু নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই জিলার চারি দিকে পাঠান বা আফগান জাতীয় ছোট ছোট স্বাধীন রাজগণের রাজ্য। স্থানাভাব বশতঃ এই জিলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিতে পারিলাম না।

১৮১৮ সালে শিখেরা পর্ব্বতমালার পাদমূল পর্য্যন্ত গিয়া দেশটী লুঠ পাট করে, কিন্তু স্থায়ীরূপে অধিকার করে নাই। ইহার কএক বৎসর পরে অধিকার করিয়াছিল। ১৮৪৮ সালে এই জিলা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে।

পেশোয়ারের অধিকাংশ বাটী ছোট ছোট ইট দ্বারা নির্ম্মিত। কলিকাতায় যেমন কাদা দিয়া ছিটে বেড়ার ঘর করে, তেমনি পেশোয়ারের লোকেরা কাষ্ঠের ফ্রেমে ইট বা পাথর আট্‌কাইয়া তাহার উপরে কাদা বা শুরকির লেপ দিয়া দেওয়াল তৈয়ার করে। রাস্তাগুলি বিশৃঙ্খল, অনেক রাস্তা আবার বড় বক্র। ডাকাইতের ভয়ে নগরের চারি দিকে ছয় সাত হাত উচ্চ একটী কাদার প্রাচীর দেওয়া হইয়াছে। প্রাচীরের বাহিরে, একটী গিরি-শিখরে বালা-হিসার নামে এক দুর্গ আছে। ইহার দেওয়াল কাঁচা ইটের, ৬০ হাত উচ্চ। নগরের পশ্চিম দিকে কাণ্টন্মেণ্ট, এখানে অনেক সৈন্য থাকে।

পূর্ব্বে এই জিলায় চুরি ডাকাইতির বড় প্রাদুর্ভাব ছিল। লোকে বলে যে, এই উপত্যকায় প্রতি দিন একটা খুন হইত। এখন অনেক বিষয়ে ভাল হইয়াছে বটে, কিন্তু চুরি ডাকাইতি ও হত্যা প্রায়ই হয়।

জামরুদ নামক দুর্গ খায়িবর পাসের গোড়ায়, পেশোয়ার হইতে পাঁচ ক্রোশ। এইটী ব্রিটিশ সীমানার ফাঁড়ি।

খায়িবর পাস বাস্তবিকই গিরিসঙ্কট বটে; ইহার দৈর্ঘ্য ঢাকা পর্য্যন্ত ১৬ ক্রোশ, সোজা নহে, নিতান্ত বক্র। একটী স্রোতের ধার দিয়া গিয়াছে, সুতরাং অকস্মাৎ প্লাবিত হইয়া যায়। পথটী সচরাচর অতি সঙ্কীর্ণ। আলি মস্‌জিদ নামক স্থানে একটা দুর্গ আছে; এখানকার প্রস্থ ২৮ হাত মাত্র। উভয় পার্শ্বের পর্ব্বত খাড়া, তাহাতে উঠা বড় কঠিন সমস্যা।

আফগানিস্থান হইতে ভারতবর্ষে আসিবার এইটী প্রধান পথ, এই গিরিসঙ্কট দিয়া কত বার আফগানেরা আসিয়া ভারতবর্ষ জয় করিয়াছে।

আফগানেরা বড় বলবান জাতি, ইহাদের নাসিকা বড়, ও দাড়ি লম্বা। পাহাড়ের লোকেরা মুসলমান বটে, কিন্তু নিতান্ত অসভ্য ও নিষ্ঠুর। রক্তপাতের পরিবর্ত্তে রক্তপাত, এবং তরবারি ও অগ্নিদ্বারা অন্য ধর্ম্মাবলম্বিদিগকে নষ্ট করাই তাহাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। এক জাতির সহিত আর এক জাতি, এক পরিবারের সহিত আর এক পরিবার এবং এক ব্যক্তির সহিত আর এক ব্যক্তি, সর্ব্বদাই মারা-মারি কাটা-কাটি করিয়া থাকে। এই প্রকার পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। এই জন্য ইহাদিগকে সর্ব্বদাই সঙ্গে অস্ত্র রাখিতে হয়; কৃষক, রাখাল, পথিক, সকলকেই সশস্ত্র হইয়া নিজ নিজ কার্য্য করিতে হয়।

কোন কোন জাতীয় লোক আপনাদের ধর্ম্ম বিষয়ে এমন অজ্ঞ যে, মহম্মদ কে, তা জানে না। প্রতিগ্রামে কোন ফকিরের নামে দরগা স্থাপন করিতে ইহাদের বড় সাধ।

লোকের বিশ্বাস, উক্ত ফকিরের গুণে বৃষ্টিপাত ও নানা মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। লোকে উক্ত দরগায় গিয়া সিন্নি দেয়। কএক বৎসর হইল, আপনাদের গ্রামে দরগা না থাকায়, আক্রিদি নামে এক জাতীয় লোকে এক জন ফকিরকে বধ করিয়াছিল।

পর্ব্বতবাসি লোকেরা চিরকালই চুরি ডাকাইতি করিয়া আসিতেছিল। খায়িবর পাস্ নামক পথ দিয়া যাহারা যাতায়াত করিত, উহারা তাহাদের লুঠ পাট করিত। পাস দিয়া লোক যাইতে দেখিলে তাহারা পাহাড়ের উপর হইতে বড় বড় পাথর ফেলিয়া দিত বা গুলি করিত অথচ পথিকেরা উপরে উঠিয়া তাহাদিগকে ধরিতে পারিত না। উহাদের কথায় বিশ্বাস নাই, অনেক বার পথিকদিগকে নির্বিঘ্নে যাইতে দিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াও আবার লোভে পড়িয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়াছে। এক্ষণে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট উহাদের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করিয়াছেন। উহারা খায়িবর পাসের পথ সর্ব্বদা নির্ব্বিঘ্ন রাখিবে, পথিকদিগকে নির্বিঘ্নে যাতায়াত করিতে দিবে; তজ্জন্য বার্ষিক কিছু কিছু টাকা পাইবে। এখন এ পথে কোন ভয় নাই।

সিন্ধু নদের ভাটির দিকে যাইবার পূর্ব্বে কাশ্মীরের বিষয়ে কিছু বলিতে চাই।

কাশ্মীর।

কাশ্মীর পাঞ্জাবের উত্তর পূর্ব্ব দিকে। এ দেশের রাজা হিন্দু। জম্মু, ও লাদাক কাশ্মীর রাজ্যভুক্ত। দেশটী বঙ্গ দেশ অপেক্ষা আয়তনে বড়, কিন্তু দেশের নিবাসী সংখ্যা ন্যূনাধিক ১৫ লক্ষ।

"পীর পাঞ্জাল" নামে এক অতি উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী পার হইয়া কাশ্মীর রাজ্যে যাইতে হয়। কোন সময়ে এক জন মুসলমান ফকির ছিলেন, পাহাড়ের পথের মধ্যে তাঁহার দরগা আছে। মুসলমান পথিকেরা গমনাগমন কালে এই দরগায় সিন্নি চড়ায়; এই গিরিসঙ্কটের চূড়া সমুদ্র হইতে ১৬০০ হাত উচ্চ। ৬০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী হইলেও, আকাশ পরিষ্কার থাকিলে লাহোরের বাটী বা মস্‌জিদ সকলের চূড়া দেখিতে পাওয়া যায়।

কাশ্মীর উপত্যকা ভূমি, কিন্তু ডিম্বাকার, অর্থাৎ মধ্যভাগ উচ্চ, ও চারি দিক ক্রমে নিম্ন হইয়া গিয়াছে। দেশের দৈর্ঘ্য ৫০ ও প্রস্থ ১২ ক্রোশ, প্রধান নদী ঝিলম। মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপত্যকাও আছে, এবং হিমালয়-রূপ বরফমণ্ডিত প্রাচীর দ্বারা দেশটী বেষ্টিত। এই দেশ সমুদ্র হইতে ৩৫০০ হাত উচ্চ, এবং সর্ব্বদাই ঠাণ্ডা; গ্রীষ্ম কালে মোগল সম্রাটেরা এই দেশে গিয়া বাস করিতেন।

রাজধানীর নাম শ্রীনগর; ঝিলম নদীর তীরে স্থিত; এই নদীই দেশের নানা স্থানে গমনাগমনের প্রধান উপায়। এই নদীর আবার নানা খাল আছে। অধিকাংশ বাটীই কাষ্ঠনির্ম্মিত, তিন চারি তল উচ্চ; বঙ্গ দেশের একচালার মতন এক দিকে গড়ানে ছাদ বা চাল; তাহার উপরে মাটীর লেপ দেওয়া। "স্থলেমানের তক্ত" নামে একটী পর্ব্বত আছে। রাজধানী হইতে সেটী বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পর্ব্বতের চূড়ায় একটী প্রাচীন প্রস্তরময় মন্দির আছে; খ্রীষ্ট জন্মের ২২০ বৎসর পূর্ব্বে অশোক রাজা এইটীর নির্ম্মাণ করান।

শ্রীনগরের নিকটেই একটী হ্রদ আছে। এই হ্রদের ভাসমান বাগানে নানা জাতি উপাদেয় ফল জন্মে।

শাহ হামদানের মস্‌জিদ বড় সুন্দর। হ্রদের তীরে একটী বাটী আছে, তন্মধ্যে মহম্মদের এক গাছি চুল অতি যত্ন ও ভক্তি সহকারে রক্ষিত হইয়াছে।

কাশ্মীরের শাল অতি বিখ্যাত। এক জাতীয় ছাগের সরু লোম দ্বারা উক্ত শাল প্রস্তুত হয়।

কাশ্মীরের লোক গৌরবর্ণ ও সুন্দর। কাশ্মীরের কতকগুলি ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কাশ্মীরী পণ্ডিত বলে। লাদাকের লোকদিগের মুখাকৃতি চীন দেশীয় লোকের মতন।

অল্প দিন হইল, ভূমিকম্পে কাশ্মীরের অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

ইতিহাস।

প্রাচীন কালে কাশ্মীরে হিন্দু রাজা ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল এই রাজ্যের লোকেরা আপনাদের ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়াছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এ দেশে মুসলমান ধর্ম্ম প্রথম প্রচারিত হয়। ১৭৫২ সালে আমেদ শাহ এই দেশ অধিকার করেন ও ১৮১৯ সাল পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের হাতে থাকে, পরে শিখেরা অধিকার করে। শিখদিগের সঙ্গে ইংরাজদিগের শেষ যুদ্ধের পর ৭৫ লক্ষ টাকা নজর দিয়া গোলাপ সিংহ এই রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন।

এ দেশের শাসন কার্য্যে বড়ই নিষ্ঠুরতা ও প্রজাপীড়ন হইয়াছে। মহারাজা হিন্দু, কিন্তু অধিকাংশ প্রজা মুসলমান। সাবেক মহারাজার বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা মৎস্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন, এ জন্য দেশ মধ্যে মৎস্যাহার নিষিদ্ধ করিয়া দেন। তৎপুত্র বর্ত্তমান মহারাজার দ্বারা শাসনকার্য্যের উন্নতি না হওয়াতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কিছু কালের জন্য এক বিচারসমিতি নিযুক্ত করিয়াছেন, এক্ষণে উক্ত সমিতি দ্বারা শাসন কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে।

বারামূলা নামে একটী পর্ব্বতের শুঁড়ি পথ আছে, এই পথ দিয়া ঝিলম নদী আসিয়াছে। নদীর দক্ষিণ তীরে নগরটী স্থাপিত, এইখানে নদীর উপরে সাত খিলানের এক সেতু আছে।

(পাঞ্জাব পুনরায়।)

সিন্ধুদেশে যাত্রা।

কাশ্মীর হইতে লাহোরে ফিরিয়া আসিয়া রেল গাড়িতে মুলতান যাওয়া যাউক। এটী অতি প্রাচীন নগর। ভয়ানক সংগ্রামের পর মহান্ সিকন্দর এই নগর দখল করেন। এই যুদ্ধে গ্রীক বীর গুরুতররূপে আহত হয়েন। মুসলমানদিগের হস্তগত হওনের পূর্ব্বে এই নগরে একটী বিখ্যাত মন্দির ও তন্মধ্যে সূর্য্যদেবের এক স্বর্ণময়ী

প্রতিমা ছিল। এই নগরে শিখেরা দুই জন ব্রিটিশ রাজ কর্ম্মচারিকে হত করাতে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। ১৮৪৯ সালে ইংরাজ সৈন্যগণ এই নগর তোপে উড়াইয়া দেয়। তদবধি ইহা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হাতে আছে। এখানে অনেক সৈন্য সামন্ত থাকে, বাণিজ্য কার্য্যও অনেক হয়।
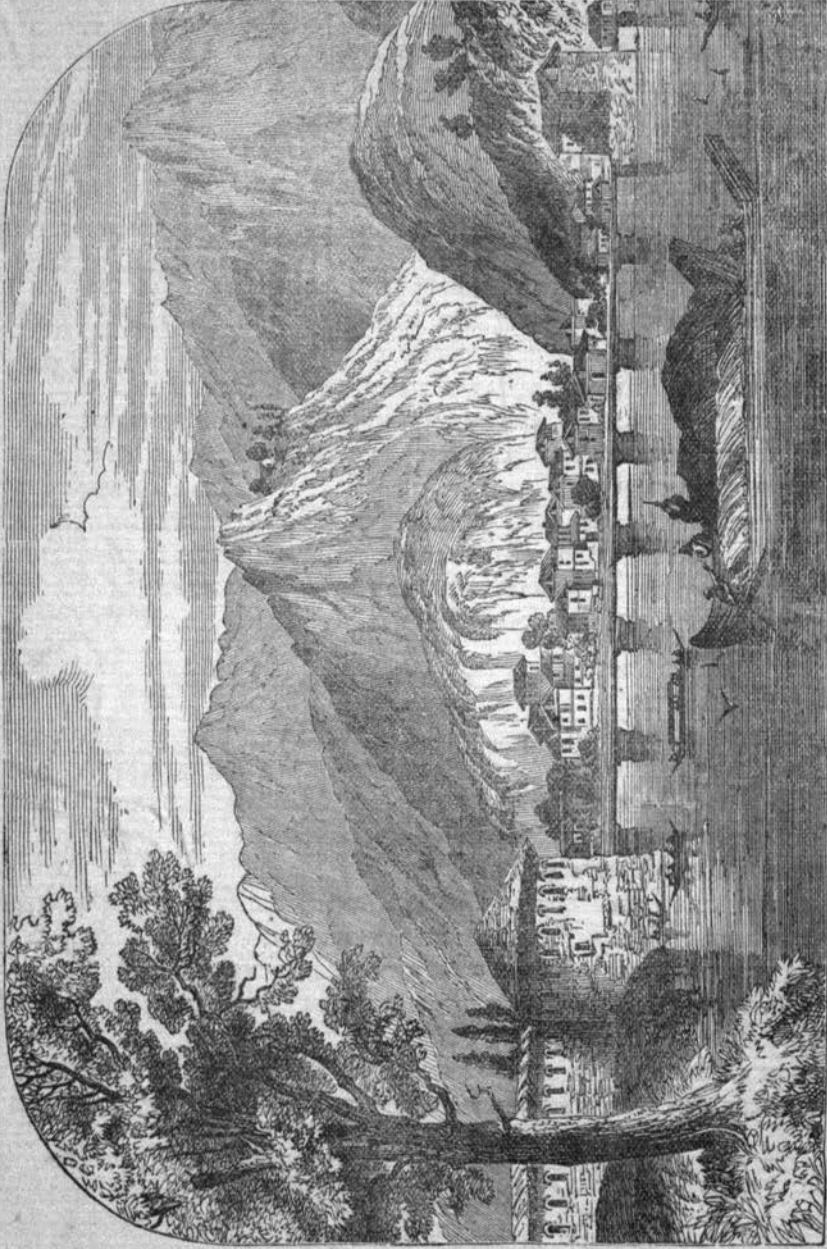
ঝিলমতীরস্থ বারামুলা।

সিন্ধু-উপত্যকা রেল পথে করাচি যাওয়া সহজ বটে, কিন্তু আমরা সিন্ধু নদের গমন-পথানুসরণ করিব। মূলতান হইতে দুই ক্রোশ দূরে, চন্দ্রভাগা নদীর তীরে শের শাহ নগর মূলতানের বাণিজ্য বন্দর

শ্রীনগরের মস্‌জিদ।
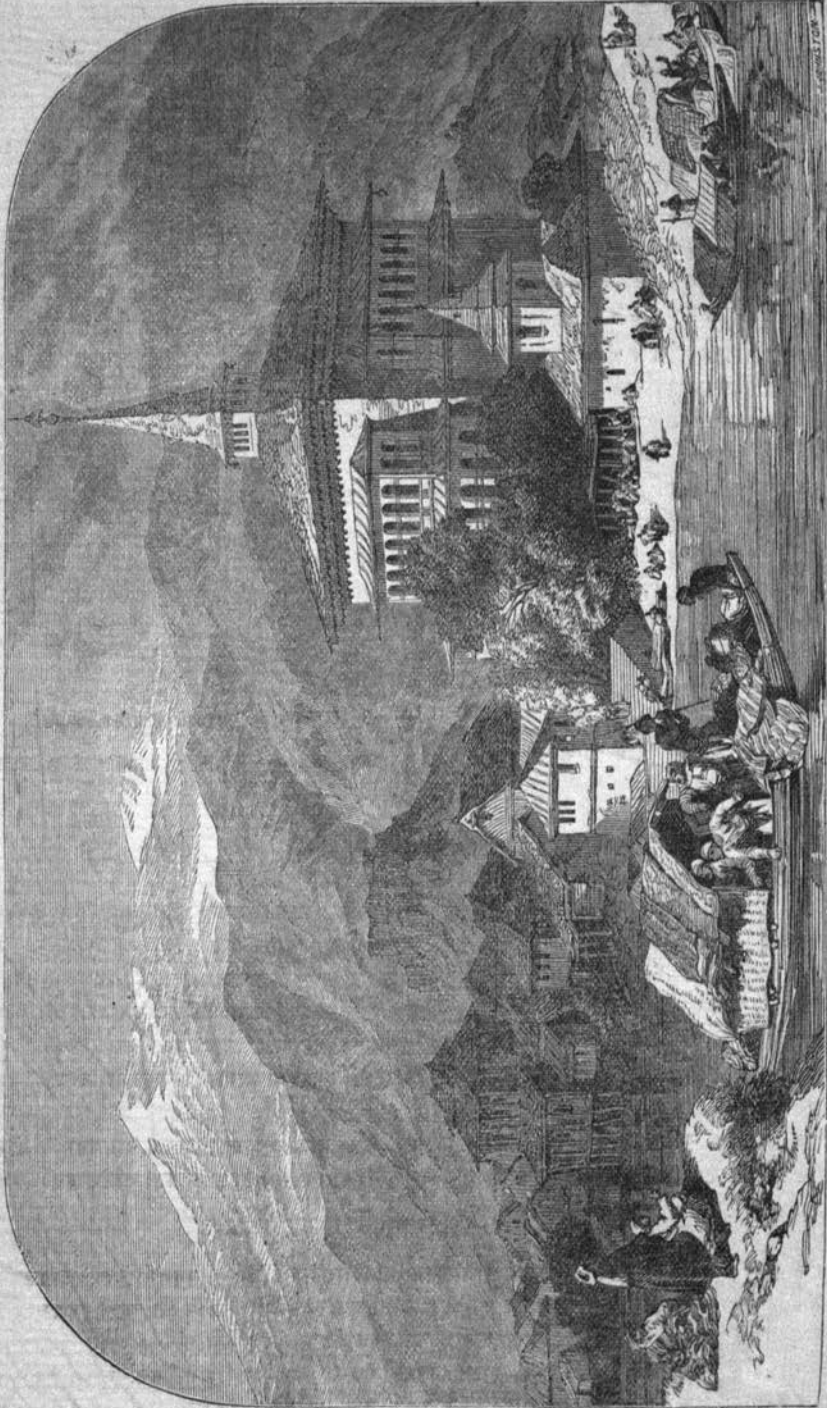
যখন রেলপথ হয় নাই, তখন এই বন্দর হইতে কলের জাহাজ সিন্ধু নদের ভাটির দিকে যাত্রা করিত। শের শাহের ৩২ ক্রোশ ভাটিতে শতদ্রু নদী চন্দ্রভাগ সহিত মিলিত হইয়াছে। এই উভয় নদীর সঙ্গম স্থানের

পরই এই নদীকে পঞ্চনদ বলে। আর একটু ভাটিতে মিঠানকোট নামক স্থানে পঞ্চনদ সিন্ধুর সহিত মিলিত হইয়াছে।

হিমালয় গিরিসঙ্কট।

সিন্ধুনদ।

হিমালয় পর্ব্বত-শ্রেণীর উত্তরাংশ হইতে সিন্ধুনদ আসিয়া আরব সাগরে পতিত হইয়াছে। ইহার গমন পথের দৈর্ঘ্য ৯০০ শত ক্রোশ। ভারতবর্ষে এমন দীর্ঘ নদী আর নাই।

সিন্ধু নদের উৎপত্তি স্থানের উচ্চতা আন্দাজ ১০৫০০ হাত, পাহাড়ের অনেক শুঁড়ি পথ, ও ভয়ানক উপত্যকা মহাবেগে অতিক্রম করত আসিয়াছে। পর্ব্বতে অত্যন্ত বৃষ্টিপাত হইলে সিন্ধু অকস্মাৎ প্লাবিত হইয়া যায়। উৎপত্তিস্থান হইতে ৪০৬ ক্রোশ পথ আসিয়া এই নদ পাঞ্জাবে প্রবেশ করিয়াছে। এখানে নদটী অতি সংকীর্ণ, প্রায় ১০০ শত গজ চৌড়া, অতি কষ্টে ভেলা করিয়া ভাটির দিকে আসা যায়; গভীরতা বড় কম; মধ্যে মধ্যে অনেক বালির চর। মিঠান কোটের ভাটিতে নদের প্রশস্ততা দুই হাজার হাতেরও অধিক; বর্ষাকালে অনেক স্থলে কূল স্পষ্ট দেখা যায় না। গভীরতা স্থান বিশেষে ১॥ হইতে ১৫ হাত। পদ্মার ন্যায় ইহার গতি সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হওয়াতে প্রায়ই তীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। সিন্ধুর ব-দ্বীপ সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত ৬২ ক্রোশ ব্যাপী। এই নদে মৎস্য অপর্য্যাপ্ত, কুম্ভীরও যথেষ্ট।

মিঠান কোটের অনতি নিম্নে সিন্ধু নদ স্বনামখ্যাত দেশে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত দেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইবে।

সিন্ধুদেশ।

সিন্ধু এক্ষণে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির এক প্রদেশ। সিন্ধু নদ দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হওয়াতে দেশের নামও সিন্ধু হইয়াছে। ভূমি পরিমাণ ২৭০০০ হাজার বর্গ ক্রোশ। কিন্তু নিবাসি সংখ্যা ২৫ লক্ষ মাত্র।

সিন্ধু নদের উভয় তীরে ছয় সাত ক্রোশ পর্য্যন্ত ভূমিতে লোকে চাস বাস করে, নহিলে দেশের অধিকাংশ স্থান রৌদ্রে পোড়া মরুভূমি মাত্র। পশ্চিম সীমানায় বালির পাহাড় বিস্তর, এগুলি বাতাসে নানা স্থানে সরাইয়া লইয়া যায়। এই মরুভূমিতে প্রাচীন জনস্থানের চিহ্ন, ও শুষ্ক জলপথ দেখিয়া বোধ হয়, এক সময়ে লোকের বাস ছিল। নানা সময়ে নদীর গমন পথ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সাগরসঙ্গমের নিকটবর্ত্তী হইয়া সিন্ধুও গঙ্গার ন্যায় শতমুখী হইয়াছে।

উচ্চ সিন্ধু প্রদেশে বৃষ্টিপাত বড় কম, বৎসরে এক ইঞ্চি মাত্র, এই জন্য দেশটী বড় গরম। এদেশে লোকে গ্রীষ্মকালে ছাতের উপর শুইয়া থাকে; শুইবার আগে জল ছিটাইয়া বিছানা ঠাণ্ডা করিয়া লইতে হয়।

ইতিহাস।

সে কালে দেশীয় রাজারা সিন্ধু দেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। মুসলমানেরা ভারতবর্ষ অধিকার করিতে আসিলে এই দেশকেই তাহাদের প্রকোপে সর্ব্বপ্রথমে পড়িতে হইয়াছিল। ৭১২ খ্রীঃ অব্দে মুসলমানেরা সিন্ধুদেশ অধিকার করত, প্রায় অবাধে বহুকাল ভোগ করে। গত শতাব্দীতে বেলুচিদিগের তালপুর নামক এক জাতীয় লোকে দেশটী অধিকার করত, আমির উপাধি ধারণ করে। ইহারা বড় মৃগয়াপ্রিয় ছিল, অনেকবার প্রজা উঠাইয়া দিয়া, শিকারের জন্য জনপদ সকল জঙ্গলে পরিণত করিত। সার চার্লেস নেপিয়র ইহাদের সহিত অন্যায় ব্যবহার করিয়া, ১৮৪৩ সালে, মিয়ানি নামক স্থানের যুদ্ধের পর দেশটী ব্রিটিশ রাজ্যসংযুক্ত করেন। কিন্তু ইহাতে প্রজাদিগের মঙ্গল হইয়াছে।

বোলান গিরিসঙ্কট (পথ)।

লোক।
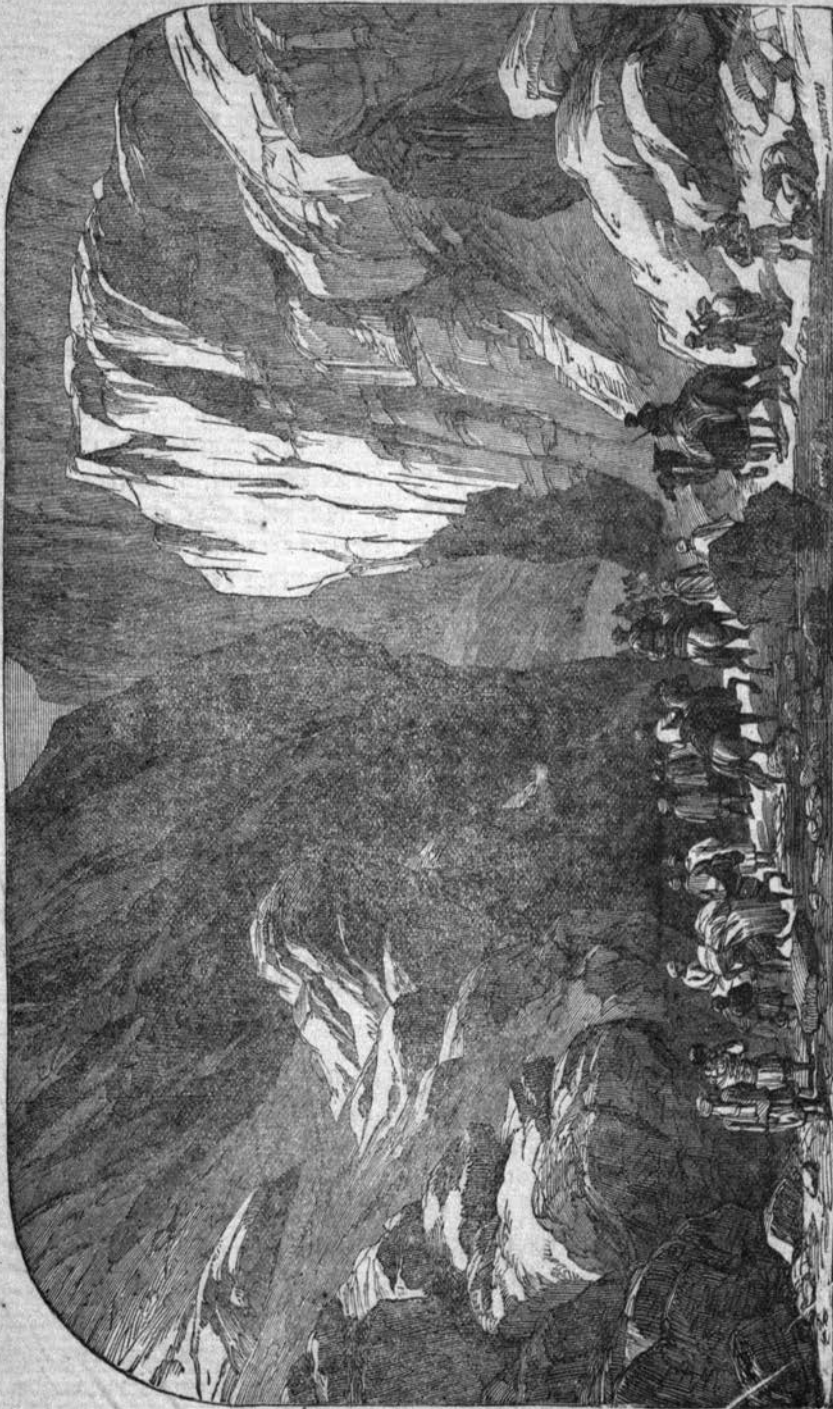
সিন্ধু-নিবাসিদিগকে সিন্ধী বলে। ইহারা দীর্ঘকায়, ও হৃষ্টপুষ্ট। অনেকে বলিয়া থাকেন, ইহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নহে। ইহাদের ভাষা সংস্কৃতমূলক; সংস্কৃতমূলক অন্যান্য ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের যে সকল নিয়মাবলী দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা ইহাদের ভাষায় আছে। সিন্ধুবাসী মুসলমানেরা আরবি অক্ষরে, এবং হিন্দুরা পাঞ্জাবী অক্ষরে এই ভাষা লিখে। প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ লোক মুসলমান; ইহাদের অধিকাংশই কৃষিকর্ম্মদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। হিন্দুরা প্রায়ই নগরে বাস ও বাণিজ্য ব্যবসায় করে। এদেশীয় অনেক লোকে এক রকম গোলাকার থাড়া টুপি পরে।

নগর।

উচ্চ সিন্ধু প্রদেশে সিন্ধুনদ চুণা পাথরের একটা পাহাড় দুই ভাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, মধ্যস্থলে একটী দ্বীপ হইয়াছে। এই দ্বীপে একটী দুর্গ আছে, তাহার নাম বক্কুর; পূর্ব্বতীরে রূড়ি ও পশ্চিম তীরে শুকুর নামে দুইটী নগর অবস্থিত। এই স্থানে সিন্ধু নদের উপরে একটী সুন্দর রেলওয়ে পুল আছে।

শুকুরের নিকট, রুক নামক স্থান হইতে এক শাখা রেলপথ বোলান পাস নামক গিরিসঙ্কট দিয়া বেলুচিস্থানের কোয়েটা পর্য্যন্ত গিয়াছে, দূরত্ব ৭৬ ক্রোশ। বোলান পাসের দৈর্ঘ্য ৩০ ক্রোশ। এই পার্ব্বত্য পথের কোন কোন স্থান এমন সংকীর্ণ যে কেবল তিন চারি জন লোক ঘোড়ায় চড়িয়া পাশা-পাশি যাইতে পারে। বর্ষাকালে নদী প্লাবিত হইলে সংকীর্ণ পথ ডুবিয়া যায়। এই পাসের চূড়া সমুদ্র হইতে ৫৬৬০ হাত উচ্চ। ১৮৭৬ সাল হইতে কোয়েটা ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়াছে। বোলান পাস দিয়া দক্ষিণ দিক হইতে সৈন্য সামন্ত লইয়া আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করা অতি সুগম, এই জন্য দেশ রক্ষার্থ কোয়েটা হস্তগত করিতে হইয়াছে। এক্ষণে পথিকেরা নির্ব্বিঘ্নে গমনাগমন করিতে পারে, বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছে, দেশের লোকও বশীভূত হইয়াছে।

শুকুর হইতে ভাটির দিকে ১১২ ক্রোশ পথ গেলে কুত্রি নামক স্থান পাওয়া যায়। এই স্থান হইতে রেলপথ দক্ষিণ-পশ্চিম-বাহি হইয়া করাচি নামক বন্দরে গিয়াছে। নদীর অপর তীরে দেড় ক্রোশ দূরে, চুণা পাথরের এক পাহাড়ের উপরে হায়দ্রাবাদ নগর; সাবেক আমিরদিগের এইটী রাজধানী ছিল। এখানকার কারুকার্য্যযুক্ত রেশমী কাপড় ও রং করা মাটীর পাত্র অতি বিখ্যাত। এখানে মাটীর বড় বড় জালা তৈয়ার হয়, তাহাতে করিয়া জালিয়ারা সিন্ধু নদে মাচ ধরে।

করাচি পশ্চিম উপকূলে, সিন্ধু দেশে এত বড় নগর আর নাই; এখানে বিলক্ষণ বাণিজ্য কার্য্য হইয়া থাকে। এই নগর ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের স্থাপিত বলিলেই হয়, কারণ সিন্ধুদেশ ইংরাজাধিকৃত হইবার পর এখানকার বাণিজ্য বৃদ্ধি, বিশাল পোতাশ্রয়, ও আর আর নানা হিতকর কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। করাচিই পাঞ্জাবের পক্ষে মহান্ বন্দর। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী হওয়াতে উচ্চ সিন্ধু অপেক্ষা এখানে গ্রীষ্ম অনেক কম।

উমর-কোট ছোট নগর;— হায়দ্রাবাদের পূর্ব্ব দিকে পূর্ব্বাঞ্চলস্থ মরুভূমির বালির পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী। ১৫৪২ সালে আফগানিস্থানে গমনকালে, এই স্থানে হুমায়ুনের পুত্র বিখ্যাত আকবরের জন্ম হয়।

কচ্ছদেশ।

কচ্ছদেশ একটী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি প্রায়দ্বীপ; সিন্ধুদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে স্থিত। বৃহৎ রণ নামক একটী অগভীর লোণা হ্রদের দ্বারা কচ্ছদেশ সিন্ধু দেশ হইতে পৃথককৃত হইয়াছে। কচ্ছ দেশ দিয়া, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে দুই শ্রেণী পর্ব্বত গিয়াছে। দেশটী প্রায়ই শস্যশূন্য। এদেশে ঘোড়া ও বন্য গর্দ্দভ যথেষ্ট। দেশের রাজাকে "রাও" বলে; ইঁহার অধীনে অনূন ২০০ শত ছোট ছোট রাজা আছে। দেশের মধ্যস্থলে স্থিত ভোজ নগরই রাজধানী। ১৮১৯ সালে ভূমিকম্প হওয়াতে দেশটী প্রায় ধ্বংস হইয়াছিল। পৃথিবী কম্পিত হইয়া, একটা প্রকাণ্ড বালির বাঁধ হইয়া যায়। লোকে তাহাকে "বিধাতার বাঁধ" বলে। সেই ভূকম্পনে নিকটবর্ত্তী প্রকাণ্ড এক ভূমিখণ্ড জলে ডুবিয়া যায়।

অরণ্য শব্দ হইতে লবণ হ্রদের নাম "রণ" হইয়াছে। এটী বালুকাময় অগভীর ঝিলমাত্র, দক্ষিণ-পশ্চিম মরশুম কালে জলপূর্ণ হয়, অন্য সময়ে শুষ্ক, লবণময়। ইহার মধ্যে কএকটী দ্বীপ আছে, তাহাতে কেবল বন্য গর্দ্দভ, ও নানা জাতি কীট পতঙ্গের গতিবিধি। কচ্ছ দেশের পূর্ব্ব সীমানায়ও একটী ছোট রণ আছে।

কাথিবারও একটী প্রকাণ্ড প্রায়দ্বীপ; কচ্ছ দেশের দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে স্থিত। ইহার পৌরাণিক নাম সুরাষ্ট্র। এদেশে কএকটী বিখ্যাত স্থান আছে। উত্তর-পশ্চিম কোণে দ্বারকা, এটী বিখ্যাত তীর্থ স্থান। কথিত আছে

যে, এই খানে কৃষ্ণের রাজধানী ছিল। দক্ষিণ উপকূলে সোমনাথ, কথিত আছে যে, ইহারই নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে কৃষ্ণ হত হন ও তাঁহার দেহ দাহ হয়। ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দে সোমনাথের বিখ্যাত মন্দির মহম্মদ গিজনি লুঠ করেন। সোমনাথের উত্তর দিকে জঙ্গল ও পর্ব্বতময় এক প্রদেশ আছে; ইহাকে গির বলে। গিরনার নামক এক পর্ব্বতের পাদদেশে অশোক রাজার সময়ের কতকগুলি প্রস্তরলিপি আছে, ২৫০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ। এই পর্ব্বতের প্রায় চূড়ার নিকটে কতকগুলি চমৎকার জৈন মন্দির আছে। ইহার পশ্চিম দিকে সুবিখ্যাত শত্রুঞ্জয় পর্ব্বত, এ পর্ব্বতেও অনেক জৈন দেবালয় আছে, এবং বহুসংখ্যক যাত্রির সমাগম হয়। পাহাড়ের গোড়ার নিকটেই পালিতানা নগর।

কাথিবার ১৮৮টী ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত; ইহার ৯৬টী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ও ৭০টী বরোদার গুইকুমারের করদ, অবশিষ্টগুলি নিষ্কর। রাজবংশীয় বালকদিগের বিদ্যা শিক্ষার জন্য এখানে একটী বিদ্যালয় আছে, তাহার নাম "রাজকুমার" কলেজ। ভবনগর সর্ব্বপ্রধান। ভারতবর্ষীয় রাজগণের মধ্যে ভবনগরের রাজাই সর্ব্বপ্রথমে নিজ রাজ্যে রেলপথ করিয়াছেন। আরও কতক রাজাও দেশের সুশাসনদ্বারা বিখ্যাত হইয়াছেন।

এখন ভবনগরে জাহাজ চড়িয়া, পূর্ব্ব উপকূল দিয়া বোম্বাই যাওয়া যাউক।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সি।

ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী অপ্রশস্ত দীর্ঘ ভূমিখণ্ড ও প্রায় সমগ্র সিন্ধুদেশ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত। ইহার পূর্ব্ব সীমানায় মধ্য-ভারতবর্ষীয় দেশীয় রাজগণের ক্ষুদ্র রাজ্যাবলি, ও নিজাম এবং মহীশূর রাজ্য। ক্ষেত্রপরিমাণ অন্যূন ৬২,০০০ হাজার বর্গ ক্রোশ, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি অপেক্ষা বরং কম। লোকসংখ্যা এক কোটি নব্বই লক্ষ। এই প্রেসিডেন্সিতে বিস্তর দেশীয় রাজগণের অধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। সে সকল রাজ্যের ক্ষেত্রপরিমাণ ৩৭,০০০ বর্গ ক্রোশ, লোক সংখ্যা ৮০ লক্ষ।

পশ্চিম-ঘাট পর্ব্বত মধ্যবর্ত্তী হওয়াতে দাক্ষিণাত্যের সমভূমি হইতে একখণ্ড অপ্রশস্ত ভূমি পৃথক হইয়াছে। সরস্বতী, মাহি, নর্ম্মদা, তাপ্তী উত্তরাঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইয়া কাম্বে উপসাগরে পতিত হইয়াছে।

পশ্চিম-ঘাট পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী দেশে বৃষ্টিপাত বিস্তর, নানা প্রকার শস্য ও কার্পাস প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য, পশ্চিম-ঘাট উপকূলে অগণ্য নারিকেল বৃক্ষ জন্মে। দক্ষিণাঞ্চলে কর্ণাটিকা, মধ্যপ্রদেশে মহারাষ্ট্র, ও কাম্বে উপসাগরে আশে পাশে গুজরাতি ভাষা প্রচলিত।

হিন্দুধর্ম্ম এদেশের প্রধান ধর্ম্ম; পাঁচ জনের মধ্যে এক জন মুসলমান। জৈন, খ্রীষ্টীয়ান ও পারসিও কতক কতক আছে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে এক জন গবর্ণর ও তাঁহার সাহায্যার্থ দুটী ব্যবস্থাপক সভা আছে।
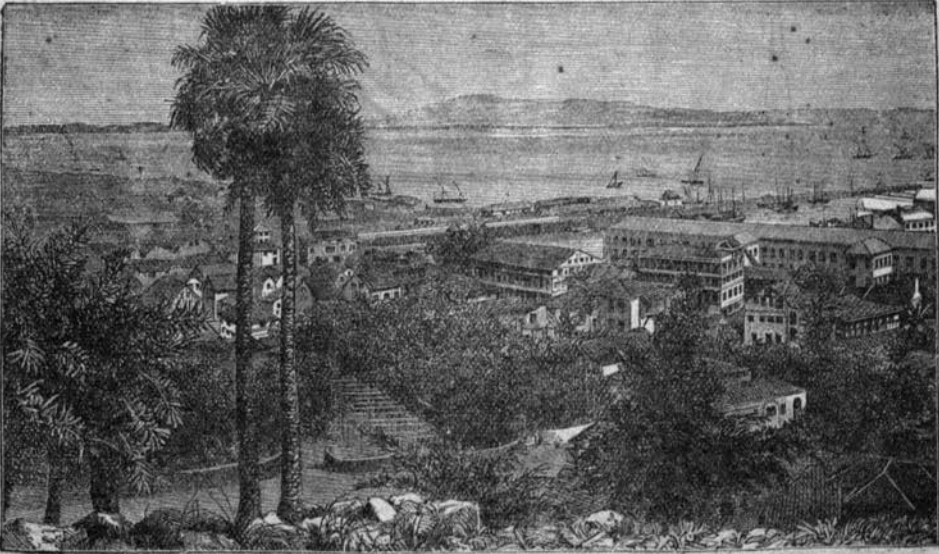
বোম্বাই পোতাশ্রয়ের দৃশ্য।

বোম্বাই নগর।

ইতিহাস।

১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগিজেরা বোম্বাই নামক দ্বীপটী অধিকার করে। ইংলণ্ডের দ্বিতীয় চার্লস রাজা পর্তুগালের এক রাজকন্যাকে বিবাহ করেন, জৌতুকস্বরূপ তাহারা বোম্বাই দ্বীপ ইংলণ্ডের রাজাকে দান করে। তিনি দেখিলেন, এ সামান্য দ্বীপটী রাখা না রাখা সমান, এই জন্য ১৬৬৮ সালে বার্ষিক ১০০ শত টাকা রাজস্ব ধার্য্য করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে দেন। সেই বৎসরই মোগলরণতরি সমূহের সিদি, বা আবিসীনীয় কর্ত্তা নওয়াব জাঞ্জিরা উক্ত দ্বীপটী আক্রমণ ও অবরোধ করেন।

১৭০৮ সালে ইংরাজেরা এই দ্বীপে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির রাজধানী স্থাপন করেন। ১৭৮৩ ইং সালের পূর্ব্বে এই প্রেসিডেন্সি বড় লাটের অধীন ছিল না। প্রথম মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সময়ে (১৭৭৪ হইতে ১৭৮২ ইং) সালসেটি, তন্নিকটবর্ত্তী অন্যান্য দ্বীপ, ও টানা ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। ১৮১৮ সালে পেশোয়ার চিরপতনের পর বোম্বাই দ্বীপ একটী বৃহৎ রাজ্যাংশের রাজধানী হইয়া পড়ে। ইহার অতি চমৎকার পোতাশ্রয়ের ন্যায় পোতাশ্রয় ভারতে আর নাই, আবার বোম্বাই ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় নগর। ইহার নিবাসী সংখ্যা ৮৪০,০০০ হাজার; তাহার চারি লক্ষ হিন্দু, দেড় লক্ষ মুসলমান, ও পঞ্চাশ হাজার পারসি।

প্রধান প্রধান দৃশ্য।

বোম্বাই নগরটী দেখিতে যেমন সুন্দর, ইহার চারি দিকের দৃশ্য তেমনি মনোহর। অতি অনুকূল স্থানে স্থাপিত বলিয়া, বাণিজ্য কার্য্যের পক্ষেও বড় সুগম, ফলে এমন বাণিজ্য-বন্দর প্রাচ্যদেশে আর নাই। বোম্বাই দ্বীপ ছিল, এখন প্রায়দ্বীপ হইয়াছে; উত্তর দিকে পাকা রেলওয়ে বাঁধ হওয়াতে কূলের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। সমুদ্র পথে বোম্বাইয়ের নিকটবর্ত্তী হইতে হইতে যে দৃশ্য নয়নপথে পতিত হয়, তাহা অতি চমৎকার। পশ্চিম-ঘাট পর্ব্বতমালা নিকটে থাকাতে দূরত্বের অধিক অনুভব হয় না। সম্মুখে বিশাল পোতাশ্রয়, ছোট ছোট দ্বীপে পরিপূর্ণ। দেশী জাহাজের শাদা পাইল বক পক্ষির ন্যায় দৃশ্য হয়। তদ্ব্যতীত বড় বড় জাহাজও নির্ব্বিঘ্নে রহিয়াছে। নগরের বাটীগুলি অতি সুন্দর, রাস্তা প্রশস্ত। সমুদ্রের তীরে ডক্, মালগুদাম, ও আড়াই ক্রোশ পথব্যাপী এক প্রকার আল্‌গা বাঁধ।

দ্বীপটী সমতল, ৫॥ ক্রোশ দীর্ঘ, এবং দেড় ক্রোশ প্রস্থ, দুই পাশে লম্বা দুইটী অনুচ্চ গিরি আছে। এই দুইটী পাহাড়ের একটী অধিক দীর্ঘ, সেইটী সমুদ্রের দিকে গিয়া একটী টেঁক হইয়াছে, তাহাকে কোলাবা পয়েন্ট বলে। পশ্চিম দিকে সমুদ্রতরঙ্গের আক্রমণে কোলাবা পয়েন্ট দ্বারা বোম্বাই পোতাশ্রয়ের রক্ষা হয়। আর একটী পাহাড় মালাবার পাহাড় (মলয় পর্ব্বত) পর্য্যন্ত গিয়া শেষ হইয়াছে; এই দুই রেখার মধ্যেই "ব্যাক্ বে"। ব্যাক বে, ও পোতাশ্রয়ের মাথার কাছে, একটু উচ্চ স্থানে দুর্গ, ইহার চারি দিকেই নগর। দেওয়াল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে, দুর্গের ভিতর এক্ষণে নানা সওদাগরের কার্য্যালয়।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে বিলাতে তুলার অত্যন্ত টান পড়াতে বোম্বাইয়ের অনেক লোক বিলক্ষণ ধনবান হইয়া উঠে। নগরের ধনবৃদ্ধি হওয়াতে সাধারণ হিতকর কার্য্যের জন্য কএকটী বৃহৎ বাটী নির্ম্মিত হয়। কলিকাতায় ও মান্দ্রাজে যেমন ইট নহিলে বাটী প্রস্তুত করিতে পারা যায় না, বোম্বাইয়ে সেরূপ নহে; সেখানে যথেষ্ট পাথর পাওয়া যায়, প্রায় সমস্ত বাটী পাথরের। সরকারি কার্য্যালয় ও হাঁসপাতাল ইত্যাদির পরেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাটী ও রেলওয়ের সদর ষ্টেশন অতি চমৎকার। ছবিতে রাস্তার দৃশ্যের আভাস পাওয়া যায়।

বোম্বাই নগরে পশুদিগের জন্য একটী চিকিৎসালয় আছে, তাহাকে পিঞ্জরপোল কহে। প্রাচীন গো, মেষ, কুকুর, বিড়াল, ও পক্ষ্যাদির এখানে শুশ্রূষা হয়। অত্রত্য কোন কোন জন্তুর অবস্থা অতি শোচনীয়, অতি পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া জৈন সম্প্রদায়স্থ লোকে এই চিকিৎসালয়ের ব্যয়ভার বহন করেন। ইহাঁরা কপোতদিগের আহার যোগান, ও পিপীলিকার বাসার কাছে চিনি ছড়াইয়া দেন। ইহাঁদের অনেকেরই নীচ প্রাণীদিগের প্রতি বিস্তর দয়া। এক সময়ে কাথিবার রাজ্যে ইংরাজ সেনার আহারার্থ মেষ বধ নিবারণ জন্য ইহাঁরা যারপর নাই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু শিশু কন্যাহত্যার বিরুদ্ধে একটী কথাও বলেন নাই।

বোম্বাই সহরের ধনবান লোকদিগের বাগান-বাড়ী মালাবার পাহাড়ে। এখানে অতি সুন্দর সুন্দর বিশ্রাম-ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। এস্থান হইতে নগর ও সমুদ্রের অতি মনোহর দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

পাহাড়ের এক প্রান্তে লাট সাহেবের বাড়ী। এই পাহাড় তলি ও সমুদ্রতট দিয়া আড়াই ক্রোশ পথ গেলে আপল্লো বন্দরে পঁহুছান যায়।

বিলাতী ডাক ও গোরা সিপাইরা বোম্বাই হইতে রওনা হয়, ও বিলাত হইতে ডাক ও গোরারা বোম্বাইয়ে আসিয়া নামে। রেল দ্বারা বোম্বাই নগর ভারতবর্ষের প্রায় সকল অংশের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এই জন্য এই নগরে নানা জাতীয় ও নানা প্রকার পরিচ্ছদধারী লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

সেনেট হাউস্‌।

ভোলানাথ বসু নিজ ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখেন, "রাজতন্ত্র শাসন-প্রণালী ভিন্ন আর কোন প্রকার শাসন-প্রণালী অবিদিত, এবং জানিবার জন্য কেহ চেষ্টাও করে নাই।" বোম্বাই অঞ্চলের শিক্ষিত যুবকগণ রাজনীতি বিষয়ক পরিবর্ত্তনের নিতান্ত আকাঙ্ক্ষী, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে সেই মান্ধাতার আমলের রীতি নীতির বড় গোঁড়া।

অধ্যাপক ওয়ার্ডসোয়ার্থ ভারতের প্রকৃত বন্ধু বলিয়া গণিত। তিনি এ দেশের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছেন। কোন কোন শিক্ষিত হিন্দুর বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন।—

"বলা অনাবশ্যক যে, আমার বিবেচনায় বালিকা বিধবার অস্তিত্ব হেতু সভ্যতার যত ক্ষতি হইয়াছে, এমন আর কিছুতে হয় নাই; ইহা বাল্যবিবাহের প্রত্যক্ষ ও অবশ্যম্ভাবী ফল। যে হিন্দুসন্তানেরা ইংরাজি শিক্ষা পাইয়াছেন, বিশেষতঃ যাঁহারা ইংরাজদিগের রাজনীতিক প্রণালী ও ধারণা স্বায়ত্ত করিতে নিতান্ত চেষ্টিত, কএক বৎসর পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম, আমার এই কথা তাঁহাদের সকলের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইবে; কিন্তু এখন আর আমার সে ভ্রান্তি নাই। এখন দেখিতে পাই, যাহা নিতান্ত কঠোর, নিতান্ত অনিষ্টকর, ও স্বার্থপরতামূলক কুসংস্কার ও অত্যাচার, শিক্ষিত দলের অনেকে, কেবল দোষাচ্ছাদনের জন্য নহে, বরং তাহার পোষকতায় আপনাদের ধর্ম্মতত্ত্ব-বিদ্যার সমস্ত কুতর্ক, ও সমস্ত চাতুর্য্য যথাসাধ্য প্রয়োগ করিতেছেন। আবার কত লোকে, সমাজসংশোধনার্থ যত চেষ্টা হইতেছে, তাহার পথে কাঁটা দিতেছেন, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে কুতর্ক ফাঁদিতেছেন, দেশহিতাকাঙ্ক্ষী লোকের চরিত্র ও অভিপ্রায়ের নিন্দা করিতেছেন। এবং আপনারা যেমন সারশূন্য, তেমনি সারশূন্য ও অপমানজনক তর্ক দ্বারা, বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, ইংরাজদের গার্হস্থ্য সমাজ হিন্দুদের পক্ষে দৃষ্টান্তস্বরূপ নহে, বরং তাহা দেখিয়া সাবধান হওয়া উচিত। ব্যভিচার নিবারণের একমাত্র উপায় বলিয়া তাঁহারা বাল্যবিবাহের পোষকতা করেন। আমার ধারণা ছিল, যে জাতির একরত্তি পরিমাণ আত্মশাসন বোধ আছে, তাহারা কখনও এ প্রকার চরিত্রগত দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে পারে না।" *

পরিবর্ত্তনাকাঙ্ক্ষিরা যে প্রকার দেশহিতৈষিতার গুমর করেন, তদ্বিষয়ে "সুবোধ পত্রিকা" বলেন।—

"না বুঝিয়া হিন্দু আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির গৌরব করা, এবং পূর্ব্ব পুরুষদিগের গুণগান করা, অথচ বলিতে গেলে তাঁহাদের বিষয় আমরা কিছুই জানি না। ইউরোপীয়, বিশেষতঃ আমাদের ইংরাজ শাসনকর্ত্তাগণের দেশীয় আচার ব্যবহারের দোষ ধরার অদম্য বাসনাও সঙ্গে সঙ্গে আছে। এইরূপ ভ্রমাত্মক সংস্কার দ্বারা ইহারা এরূপ চালিত হয় যে, প্রাকৃতিক বিদ্যা বিষয়েও ইহারা ইউরোপীয়দিগের প্রাধান্য স্বীকার করিতে চাহে না। বোম্বাই নগরে এই দলের এক খানি সংবাদপত্র আছে, কিছু দিন পূর্ব্বে তাহাতে লিখিত হইয়াছিল

* Letter to Mr. Malabari.

বোম্বাই নগরের রাস্তা।
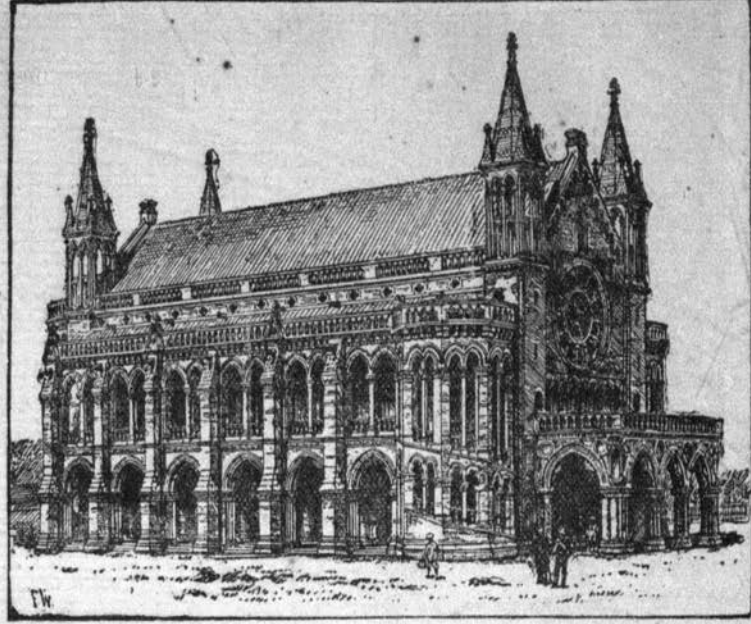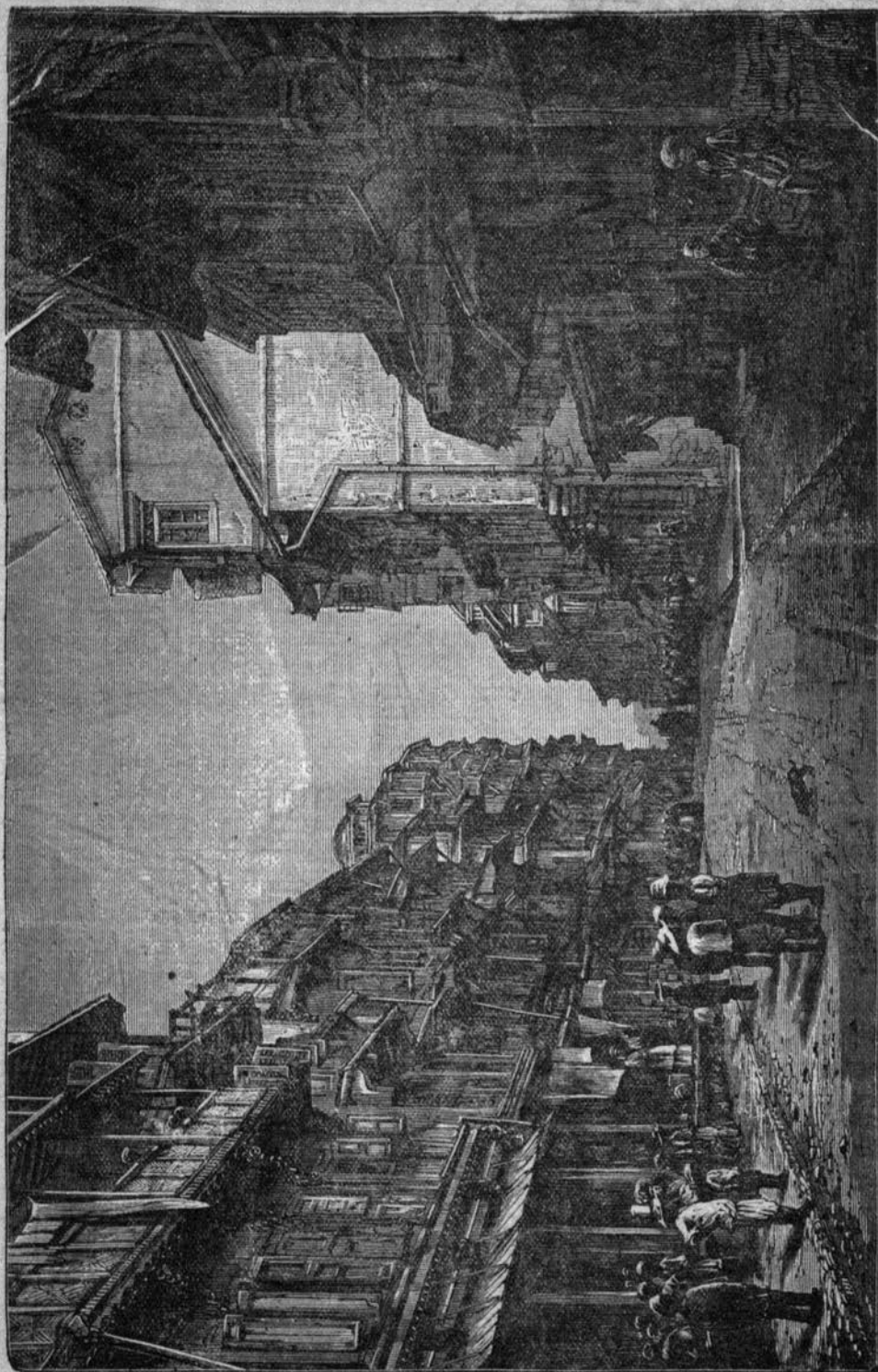
যে, পুরাকালের হিন্দুরা প্রাকৃতিক জগতের নিয়মাবলী এমন জ্ঞাত ছিলেন, এবং স্বভাবের উপর তাঁহাদের এমন অধিকার ছিল যে, যখন ইচ্ছা, এবং যেখানে ইচ্ছা, বৃষ্টিবর্ষণ করাইতে পারিতেন। এই প্রাচীন বিলুপ্ত বিদ্যা আধুনিক জগতে প্রকাশ করা এই দলস্থ লোকের নিতান্ত কর্ত্তব্য।"

"হিন্দু" নামক সংবাদপত্র বলেন, "শুনিতে পাই, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদিগের প্রধান আড্ডা, ও এক্ষণকার রাজনীতিক বিষয় আলোচনার প্রধান স্থান পুনা নগরে হিন্দুয়ানী পুনর্জীবিত করিবার উদ্যোগ হইতেছে।"

পক্ষান্তরে বোম্বাইয়ে আবার কএক জন উদ্যোগী সমাজসংস্কারকও আছেন। বোধ হয়, হিন্দুয়ানী পুনরুজ্জ্বল করিবার চেষ্টা শীঘ্রই লোপ পাইবে।

পারসি।

সংখ্যা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বোধ হয়, ভারতবর্ষে পারসিদিগের তুল্য ধনবান আর কোন সম্প্রদায় নাই। স্বদেশে মুসলমানদিগের তাড়না হেতু সে কালে যে পারসিকেরা পলাইয়া ভারতবর্ষে আইসে, বোম্বাইয়ের পারসিরা তাহাদের বংশধর।

প্রাচ্য বাণিজ্য ব্যবসায়ের অনেকটা ইহাদের হস্তগত। হিন্দুদের ন্যায় জাতিভেদরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ না হওয়াতে ইহারা অবাধে নানা দেশে ভ্রমণ করিতে পারে। বিদ্যা শিক্ষা বিষয়েও ইহাদের বিলক্ষণ যত্ন আছে।

ধর্ম্ম বিষয়ে ইহারা জোরষ্টার বা জরথুস্তর শিষ্য; ইহাদের ধর্ম্ম গ্রন্থের নাম "আবেস্তা"। ইহারা মুখে আপনাদিগকে একেশ্বরবাদী বলিয়া থাকে বটে; কিন্তু অগ্নি, বায়ু, জল ও পৃথিবীর আরাধনা করিয়া থাকে। ইহারা গোমূত্রকে নিরং বলে, এবং হিন্দুদের ন্যায় অতি পবিত্র বলিয়া মান্য করে। প্রতি দিন প্রাতঃকালে গোচনা আনীত হওয়া চাই, মুখে, হাতে, পায়ে, সকাল বেলা গোচনার ছিটা দিতে হয়। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে গোচনা পান করার বিধিও আছে। ইহাদের মন্দিরে অহোরাত্র আগুন জ্বালিয়া রাখিতে হয়। মানুষ মরিলে পারসিরা গোর দেয় না, জ্বালায় না, ঘেরা ঘোরা এক স্থানে (ইহাকে টাউয়ার বলে) রাখিয়া দেয়, আর শকুনীতে খাইয়া ফেলে। "আবেস্তা" পুস্তকে লিখিত আছে যে, পৃথিবীতে মৃত দেহ পুতিয়া রাখিলে পৃথিবী অপবিত্রা হন, বলিয়া দুঃখ করেন। উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত যে স্থানে মৃত দেহ রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহার নাম "টাউয়ার অফ্ সাইলেন্স।" টাউয়ারের প্রাচীরের উপরে সচরাচর দুই একটী শকুনী ভিতর দিকে মুখ করিয়া স্পন্দহীনের ন্যায় বসিয়া থাকে, ভিতরে মরা রাখিয়া গেলেই তাহারা নামিয়া গিয়া আহার করে, পুনরায় স্ব স্ব স্থানে গিয়া পূর্ব্ববৎ বসিয়া থাকে।

কোন কোন পারসি,—যেমন মৃত স্যর জেমসেটজি জিজি ভাই—দানশীলতার বিলক্ষণ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের প্রধান সমাজসংস্কারক মিং এম্, মালাবারি এই সম্প্রদায়ভুক্ত।

অনেকে দুঃখ করিয়া বলেন যে, পারসি সম্প্রদায়ের যুবকদের অনেকে পূর্ব্বকার লোকদের ন্যায় পরিমিতাচারী নহেন। আবার অনেকে থিয়েটার লইয়া ব্যস্ত, এটীও সুলক্ষণ নহে। এই সকল দোষ নিবারণচেষ্টা করা প্রধান প্রধান লোকদিগের উচিত।

গিরিগুহাস্থ মন্দির।

ভারতবর্ষে গিরিগুহায় যে সকল মন্দির আছে, তাহা অতি আশ্চর্য্য বিষয়। পাহাড় কাটিয়া সে কালের হিন্দুরা যেরূপ মন্দির করিয়া গিয়াছেন, তেমন মন্দির পৃথিবীর আর কোন দেশে নাই। পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়া বলেন, খ্রীষ্ট জন্মের ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুরা এই প্রকারে পাহার কাটিয়া মন্দিরনির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন, এবং খ্রীষ্টাব্দের ৮০০ সালে এ কার্য্য স্থগিত হয়। দশ ভাগের নয় ভাগের অধিক পাহাড়-কাটা মন্দির বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে। বোম্বাই হইতে এলিফেন্টা বা হস্তী নামক দ্বীপ প্রায় তিন ক্রোশ, এই দ্বীপে একটী বিখ্যাত গুহা আছে। সাবেক ঘাটের নিকট পাথরের একটা হস্তী ছিল, তাই পর্ত্তুগিজেরা এই দ্বীপের নাম হস্তীদ্বীপ রাখে।

এই দ্বীপের পশ্চিমস্থ পাহাড় সমুদ্র হইতে ১২৪ হাত উচ্চ, ইহাতে সেই বিখ্যাত বৃহৎ গহ্বর। এক প্রকাণ্ড অখণ্ড পাথর কাটিয়া এই গুহা প্রস্তুত হইয়াছে, আবার দুই দিক কাটিয়া ফেলাতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে প্রবেশের পথ হইয়াছে। গুহায় প্রবেশের প্রধান দ্বার উত্তর দিকে, সম্মুখে অনেক প্রশস্ত চাতাল দুইটী প্রকাণ্ড সম্পূর্ণ ও দুইটী অর্দ্ধ স্তম্ভের উপরে রহিয়াছে; তাহাতে একটা পুরু ও উচ্চ শৈলের নীচে দিয়া তিনটী পথ হইয়াছে। উক্ত শৈলের উপরে নানা জাতীয় বন্য লতা শোভা পায়। ভিতরে তিনটী প্রকোষ্ঠ, মধ্যস্থলের প্রকোষ্ঠই প্রধান দেবালয়, দুই পার্শ্বে দুটী ছোট ছোট কক্ষ।
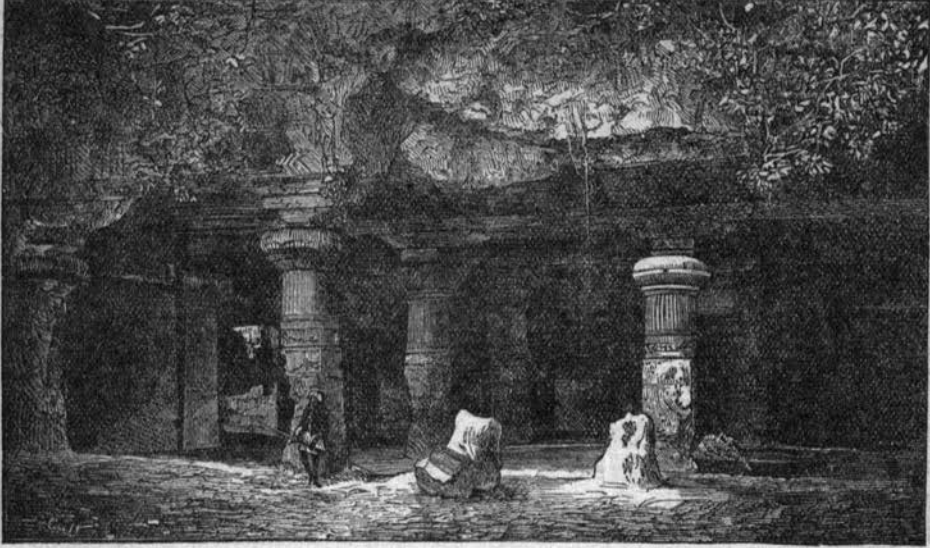
এলিফাণ্টা গহ্বরের প্রবেশ-পথ।

প্রধান মন্দির দীর্ঘে ১৮৬ হাত, প্রস্থেও ঐ রূপ, ২৬টী সম্পূর্ণ ও ১৬টী অর্দ্ধ স্তম্ভের উপর স্থাপিত; এক্ষণে আটটী সম্পূর্ণ স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এগুলির উচ্চতা ১০ হইতে ১৩ হাত।

মন্দিরে প্রবেশ করিলেই সম্মুখে ত্রিমূর্ত্তি, ইহার উচ্চতা ১৩ হাত। ইহার উভয় পার্শ্বে প্রকাণ্ড দুই দ্বারবানের মূর্ত্তি, এক একটীর উচ্চতা ৮ হাত। ত্রিমূর্ত্তির নিকটবর্ত্তী হইলে মন্দিরের গর্ভ বা বিগ্রহ দক্ষিণ দিকে থাকে, মধ্য স্থলে যাইবার জন্য চারি দিকে চারিটী দ্বার আছে; প্রতি দ্বারদেশে এক একটী প্রকাণ্ড দ্বারবানমূর্ত্তি স্থাপিত। মধ্য স্থলের প্রধান কক্ষটী শাদা, দীর্ঘে প্রস্থে ১৩ হাত—চতুষ্কোণ। কক্ষের মধ্য স্থলে দীর্ঘে প্রস্থে ৬ হাত এক বেদি আছে, এটীর উচ্চতা দুই হাত। বেদির মধ্য স্থলে শিবলিঙ্গ স্থাপিত; কিন্তু মন্দিরের পাথর অপেক্ষা শিবলিঙ্গের পাথর বেশি শক্ত। ত্রিমূর্ত্তির পূর্ব্ব দিকস্থ কক্ষে এক হরপার্ব্বতী মূর্ত্তি আছে, এ দেশে অর্দ্ধনারী বলে। এই মূর্ত্তির চারি দিকে কতকগুলি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি স্থাপিত। হরপার্ব্বতী মূর্ত্তি প্রায় ১২ হাত উচ্চ। ত্রিমূর্ত্তির পশ্চিম দিকস্থ কক্ষে হর ও পার্ব্বতীর দুটী স্বতন্ত্র মূর্ত্তি স্থাপিত।

ইহা দ্বারাই জানা যায় যে, এই মন্দির শৈব মতাবলম্বি হিন্দুরা প্রতিষ্ঠিত করেন। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে এই মন্দির খোদিত হইয়াছে।

সালশেত্তি দ্বীপে, বোম্বাই হইতে পুনা গমন পথে, কারলি নামক স্থানে, এবং নিজাম রাজ্যের এলাকাভুক্ত অজন্ত নামক স্থানে আরও পুরাতন বৌদ্ধ গুহা-মন্দির আছে। অজন্তার অনতিদূরে এলোরা নামক স্থানে বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু মন্দির আছে। তন্মধ্যে কৈলাস নামক মন্দিরটী বড়ই চকৎকার। এক খণ্ড শৈল কাটিয়া, সমস্ত পাথর ফেলিয়া দিয়া, এই মন্দিরটী বাহির করা হইয়াছে, মন্দিরের মধ্যভাগের দৈর্ঘ্য ১৬৪ হাত, প্রস্থ ১০০ হাত; কোন কোন স্থানের উচ্চতা ৬৬ হাত। শিবের নামে প্রতিষ্ঠিত হইলেও মন্দির মধ্যে বিষ্ণু ও অন্যান্য অনেক দেবতার মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের নিকটবর্ত্তী কোন উঁদুইয়ের জলে কোন গুরুতর রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করাতে শিবপুরের রাজা এদু খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন।

গুজরাত।

গুজরাত বোম্বাই প্রেসিডেন্সির উত্তর দিকে, কাম্বে অখাতের পার্শ্বে, বোম্বাই নগরের উত্তর দিকে, দামান নামক স্থানে। ইহাই কাম্বে অখাতের দক্ষিণ উপকূলস্থ সীমানা। উত্তর সীমানা রাজপুতানা। কখন কখনও কাথিবার রাজ্যকে এই প্রদেশের মধ্যে ধরা হয়। কাথিবার ছাড়া গুজরাতের ক্ষেত্রপরিমাণ অন্যূন ৫০০০ বর্গ ক্রোশ।

তাপ্তী, নর্ম্মদা, মাহী ইত্যাদি কএক নদী এই দেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া কাম্বে অখাতে গিয়া পতিত হয়।

গুজরাত দেশের অধিকাংশ ভূমি এমন উর্ব্বরা যে তজ্জন্য ইহাকে ভারতের উদ্যান বলা যায়। কৃষ্ণবর্ণ মাটীতে বেশির ভাগ কাপাস জন্মে। বাজরা যথেষ্ট হয়। এদেশের উত্তরাঞ্চলের গোরু খুব বড় ও সুন্দর

এলিফাণ্টা গহ্বরের অন্তর্ভাগ।
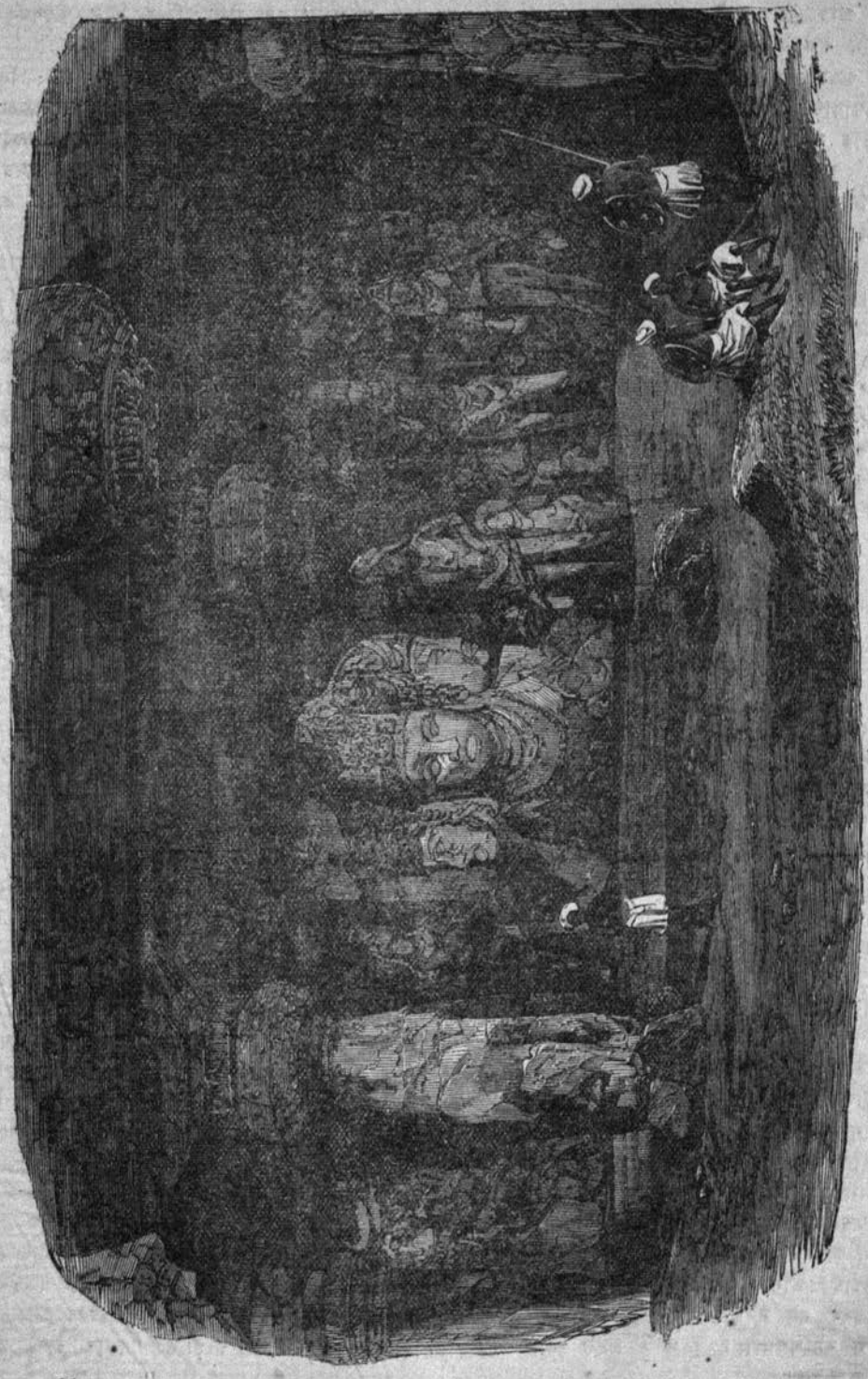
প্রায় এক কোটি লোকে গুজরতি ভাষা বলে। এ ভাষা হিন্দির মতন, কিন্তু হিন্দি অপেক্ষা ইহাতে পারসি শব্দ অধিক দেখিতে পাই। অক্ষর দেবনাগরি, কিন্তু মাত্রা নাই।

গুজরতিরা অতি নিপুণ এবং শ্রমশীল লোক, বাণিজ্য ব্যবসায়ে বড় পটু বলিয়া বিখ্যাত; কিন্তু বড় কুসংস্কারাপন্ন। ভল্লভাচারিদিগের অধিকাংশ গুজরাতি। ইহারা গুরুকে মহারাজা বলে, এবং কৃষ্ণের মূর্ত্তিমান অবতার বলিয়া তাহাদের আরাধনা করে। এই মহারাজারা পশুবৎ যথেচ্ছাচার দ্বারা আপনাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করে, অথচ বোম্বাইয়ের ধনী সওদাগরেরা আপনাদিগের স্ত্রী ও কন্যাদিগকে এমন লোকদিগের সহিত সহবাস করিতে দেয়। এ অতি ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া গণ্য। গুজরাতে যত জৈন মতাবলম্বী লোকের বাস, এত আর কোন অঞ্চলে নহে।

দেশের কতক অংশ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত, আর কতক অংশ দেশীয় রাজগণের দ্বারা শাসিত হইয়া থাকে।

গুজরাতের কএকটী প্রধান নগরের বিষয় লিখিতেছি।—

সুরাট তাপ্তী নদীর তীরে, বোম্বাই হইতে ৮৪ ক্রোশ উত্তরে। বলিতে গেলে এটী আধুনিক নগর। ১৬১২ সালে সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজেরা এই স্থানে কুঠী স্থাপন করেন। ১৬৬৪ সালে শিবজি এই নগর লুঠ করেন, তদবধি কএক বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর মহারাষ্ট্রীয়েরা এই নগর আক্রমণ করিয়াছিল। ১৬৯৫ সালে এই নগরই ভারতবর্ষের প্রধান বন্দর বলিয়া গণ্য ছিল। ১৭৫৯ সালে ইংরাজেরা এই নগর দখল করেন, কিন্তু ১৮০০ সাল পর্য্যন্ত নওয়াবেরা নামমাত্র ইহার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পূর্ব্বে এখান হইতে অনেক তুলা বিদেশে রপ্তানি হইত। বোম্বাই নগরের উন্নতি হওয়াতে সুরাটের আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই, তথাপি বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে এটী চতুর্থ নগর।

ব্রোচ্ সুরাট হইতে ১৯ ক্রোশ উত্তরে, নর্ম্মদার তীরে, মুখ হইতে ১০ ক্রোশ দূরে। খ্রীষ্টীয় সালের প্রথম শতাব্দীতে পশ্চিম ভারতে ব্রোচ্ অতি প্রধান বন্দর ছিল। ১৮০৩ সালে ইংরাজেরা সিন্ধিয়ার নিকট হইতে এই নগর পুনরুদ্ধার করেন। সে কালে এই নগর হইতে যে সকল জিনিস বিদেশে রপ্তানি হইত, তন্মধ্যে কাপড়ই প্রধান ছিল। খ্রীষ্টীয় সালের একাদশ শতাব্দীতে পারসিরা আসিয়া এই নগরে বাস করে।

বরদা ব্রোচ্ হইতে ২২ ক্রোশ উত্তরে, এটী গুইকুমার রাজ্যের রাজধানী। গুইকুমার পরিবার জাতিতে মহারাষ্ট্রীয়, ১৭২০ সালে অতি সামান্য অবস্থা হইতে এই পরিবারের অভ্যুদয় হয়। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ কালে তখনকার গুইকুমার খান্দি রাও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ সাহায্য করেন এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও গুইকুমারকে তাহার পুরস্কার দান করেন। ইহাঁর পরে মহ্লার রাও খান্দি রাওকে বিষ খাওয়াইতে চেষ্টা করাতে কারাবদ্ধ হয়েন। নূতন গুইকুমার সোণা ও রূপার কামান তৈয়ার করাইয়া বিস্তর টাকা অপব্যয় করেন, এবং প্রজাশাসন বিষয়ে এমন অত্যাচার করেন যে, তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবেন বলিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভয় দেখান। গবর্ণমেণ্টের এই রূপ বিশ্বাস যে, তিনি ব্রিটিশ রেসিডেণ্টকেও বিষ খাওয়াইতে চেষ্টা করেন, এই জন্য তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া খান্দি রাওর স্ত্রীর পোষ্যপুত্রকে সিংহাসন দত্ত হয়। বোধ হয়, ভারতবর্ষে বর্ত্তমান গুইকুমারের তুল্য শিক্ষিত রাজা আর নাই।

মিং মালাবারিকে এক পত্র লিখিয়া গুইকুমার ভারতীয় সমাজসংস্কারকদিগের ত্রুটি প্রদর্শন করিয়াছেন, "বাল্যবিবাহ ও বিধবাদের বিষয়ে যে তর্ক বিতর্ক চলিয়াছে, আমি তাহা মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি; আপনি বিলক্ষণ পারদর্শিতা সহকারে উক্ত দুইটী প্রথার বিরুদ্ধে কথা কহিয়া ভারতহিতৈষী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। আমার বিবেচনায় এ বিষয়ে বিস্তর বক্তৃতা ও লেখা হইয়াছে; এরূপ কার্য্যতৎপরতা নিতান্ত উপকারী হইলেও ইহার একটা সীমা থাকা আবশ্যক। এ সকল দোষ নিবারণ করিতে হইলে "কাজ" চাই, কথায় কিছু নয়, কেবল কাজের দ্বারাই ইহার নিবারণ হইতে পারে। মনে মনে চিন্তা করিলে বড় দুঃখ হয় যে, আমাদের দেশস্থ শিক্ষিত যুবকেরা নানা সুযোগ সত্ত্বেও সাহস পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া, কেবল কথায় নহে, দৃষ্টান্ত দ্বারা আপনাদের বিদ্যা শিক্ষার ফল প্রদর্শন করেন না। যে সাহসের বলে নিজের উপরে দায়িত্ব লইয়া, অবাধে কার্য্য সাধন করা যায়, সেই সাহসের ন্যায় দুর্ল্লভ গুণ জগতে আর নাই।"

আমেদাবাদ বরদার ৩১ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে, সবর্ম্মতী নদীর তীরে স্থিত। গুজরাতের মধ্যে এটী প্রথম, ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মধ্যে তৃতীয় নগর। ১৩১৪ সালে আমেদ শাহ এই নগর স্থাপন করেন। ১৫৭৩ সালে আকবর এই নগর ও গুজরাতের অবশিষ্ট অংশ হস্তগত করেন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ভারতে এমন সমৃদ্ধিশালী নগর অতি অল্পই ছিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা ১৭৫৭ সালে, ও ইংরাজেরা ১৮১৮ সালে এই নগর দখল করেন।

মুসলমানেরা এই নগরে কএকটী সুন্দর মসজিদ এবং সমাধি স্তম্ভ নির্ম্মিত করেন। কিন্তু ইহার অধিকাংশের গঠনপ্রণালি হিন্দুরীতিসঙ্গত। কতকগুলি জানালা ও পর্দ্দার কারু কার্য্য অতি চমৎকার। এক কালে আমেদাবাদের রেশমী, ও জরির কারুকার্য্যযুক্ত সূতার কাপড় ও অন্যান্য সূত্রবস্ত্র অতি বিখ্যাত ছিল। একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহার অর্থ এই যে, রেশম, সোণা ও সূতার তিনটী থেইয়ে আমেদাবাদের ভাগ্যলক্ষ্মী ঝুলিতেছে। যদিও এখন তেমন শিল্পকার্য্য হয় না, তথাপি এই কার্য্যদ্বারা অনেকে জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

এ নগরে উত্তম মৃৎপাত্র ও কাগজ প্রস্তুত হয়।

মহারাষ্ট্র।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের সংখ্যা প্রায় এক কোটি সত্তরি লক্ষ। ইহাদের দেশটী ত্রিকোণাকৃতি। আরব সাগরের উপকূল এই দেশের পত্তন স্থান, ইহার দক্ষিণ ও উত্তর প্রান্তে পর্ত্তুগিজদিগের অধিকৃত গোয়া ও দামান। ইহার অগ্রভাগ দাক্ষিণাত্যে, বোম্বাই হইতে ৩৫০ ক্রোশ।

সমুদ্রের কূলবর্ত্তী প্রদেশকে কঙ্কণ বলে, এ প্রদেশ অতি বন্ধুর। এক একটী কন্দর ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হইয়া ঘাট পর্ব্বত পর্য্যন্ত গিয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলের সমভূমি সমুদ্র হইতে ১৩৩২ হাত উচ্চ। ইহাও অসমান, মধ্যে মধ্যে অনুচ্চ শৈল, তাহার অনেকগুলিতে দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে।

মহারাষ্ট্রীয় ভাষা অনেকটা হিন্দির মতন, কিন্তু হিন্দি অপেক্ষা ইহাতে সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য অধিক। পুস্তকের অক্ষর নাগরি, কিন্তু একটু পরিবর্ত্তিত; ইহাকে "বালবোধ" বলে। মোদি নামে আর এক প্রকার অক্ষর বিষয় কর্ম্ম সংক্রান্ত লেখা পড়ায় ব্যবহৃত হয়।

মহারাষ্ট্রীয়েরা খর্ব্বকায়, কিন্তু বড় ক্লেশসহিষ্ণু। বাঙ্গালির মাথা খোলা, কিন্তু এক থান কাপড়ের কমে মহারাষ্ট্রীয়ের একটা পাকড়ি হয় না। ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলের হিন্দুরা যেরূপ মুসলমানদিগের প্রভুত্বাধীনে ছিল, মহারাষ্ট্রীয়েরা তেমন ছিল না; এই জন্য ইহাদের স্ত্রীলোকেরা আজিও অনেক স্বাধীনতা ভোগ করিয়া থাকে।

খ্রীষ্টীয় অব্দের আরম্ভ কালে শালিবাহন নামে এক রাজা মহারাষ্ট্র দেশের অধিপতি ছিলেন। ইহাঁর পিতা কুম্ভকার ছিলেন, গোদাবরীর তীরে পৈতুন নগর ইহাঁর রাজধানী ছিল।

তাঁহার অব্দ (ইং ৭৭ সাল) নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণাঞ্চলে আজিও প্রচলিত। ইহার পরে অন্য কোন কোন রাজবংশ এ দেশে রাজত্ব করেন। ১২৯৪ সালে আলা-উদ্দিন সসৈন্যে আসিয়া যৎকালে দাক্ষিণাত্য জয় করেন, তৎকালে দেবগিরি বা দৌলতাবাদের রাজারা সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। ১৩৪৭ সালে বাহমানি রাজ্য স্থাপিত হয়, ইহাই দাক্ষিণাত্যের প্রথম স্বাধীন মুসলমান রাজ্য। গুলবর্গায় ইহার রাজধানী ছিল। এই রাজত্বের পতনের পর ছোট ছোট পাঁচটী রাজ্য স্থাপিত হয়, এই পাঁচটীর রাজধানী. বিজয়পুর, আমেদ নগর, গোলকণ্ডা, এলিচপুর, এবং বিদার। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে শিবজির অভ্যুদয় হয়, এবং মুসলমানদিগের দ্বারা দাক্ষিণাত্য অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে আপনাদের যে ক্ষমতা ছিল, মহারাষ্ট্রীয়েরা সে ক্ষমতার পুনরায় উদ্ধার করেন।

শিবজির জন্ম দুর্গমধ্যে, উন্নতি দুর্গ মধ্যে, মৃত্যুও দুর্গমধ্যে। দুর্গমধ্যে জন্ম ও উন্নতি হওয়াতে আরঙ্গজেব তাঁহাকে সর্ব্বদাই পাহাড়ে ইন্দুর বলিতেন। এক বার কোন বিষয়ের আপোষে মীমাংসা করণার্থ শিবজি আফজল খাঁকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে মারিয়া ফেলাতে নিজ দেশে শিবজির বড়ই নাম বাহির হয়। একদা মাতার আশীর্ব্বাদ লইয়া ও কঠোর দেবারাধনা করিয়া শিবজি নিজ উদ্দেশ্য সাধনার্থ প্রস্তুত হয়েন। প্রথমে লৌহ বর্ম্ম পরিয়া তাহার উপরে তিনি যথারীতি পরিচ্ছদ পরেন। দক্ষিণ হস্তের আস্তিনের ভিতর একখান তীক্ষ্ণ ছুরি লুকাইয়া রাখেন, এবং বাম হাতের মুষ্টিতে পাঞ্জা নামে এক রকম লৌহনির্ম্মিত বাঘের থাবা ছিল। এই ভাবে আফ্‌জল খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া ভান্‌ করিয়া ভয়ে যেন কাতর হইলেন। আফ্‌জল খাঁর সঙ্গে এক জন মাত্র লোক ছিল। শিবজির এই ভাব দেখিয়া তিনি তাহাকে পর্য্যন্ত স্থানান্তরিত করিলেন। উভয়ের দেখা হইল। যথারীতি কোলাকুলি করিবার সময়ে শিবজি এক অস্ত্রের আঘাতে আফ্‌জল খাঁকে মারিয়া ফেলিলেন। এই বিশ্বাসঘাতকতায় মহারাষ্ট্রীয়েরা বড় বাহবা দিল, কারণ ধূর্ত্ততাই ইহাদের প্রধান বল ছিল।

শিবজির মূল বচন ছিল, "গোব্রাহ্মণ," অর্থাৎ তিনি গোব্রাহ্মণের রক্ষার্থ যুদ্ধ করিতেন। আপন সঙ্গিদিগকে তিনি লুঠের ভাগ দিবারও আশা দিতেন। লর্ড মেকলে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অত্যাচারের এই রূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলস্থ পর্ব্বতাঞ্চল হইতে আরও অদম্য এক জাতীয় লোক উপস্থিত হইল। দেশীয় রাজারা সকলেই ইহাদিগের ভয়ে ভীত ছিলেন, কেবল ইংরাজের কাছে ইহারা নত হইয়াছে। আরঙ্গজিবের

রাজত্ব কালে এই বন্য দস্যুদের প্রাদুর্ভাব হয়। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রজারা মহারাষ্ট্রীয়দিগের নামে কম্পিত হইতে লাগিল। অনেক স্থবা তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিল। ইহাদের রাজ্য ভারত উপদ্বীপের এক সমুদ্রকূল হইতে অপর সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। মহারাষ্ট্রীয় সেনানায়কেরা পুনা, গোয়ালিয়র, গুজরাত, বেরার ও তাঞ্জোরে রাজত্ব করিতে লাগিল। এত প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তবু ইহাদের দস্যুবৃত্তি যায় নাই। এখনও তাহারা এই পৈতৃক ব্যবসা করিয়া থাকে। যে কোন দেশ তাহাদের অধীনতা স্বীকার
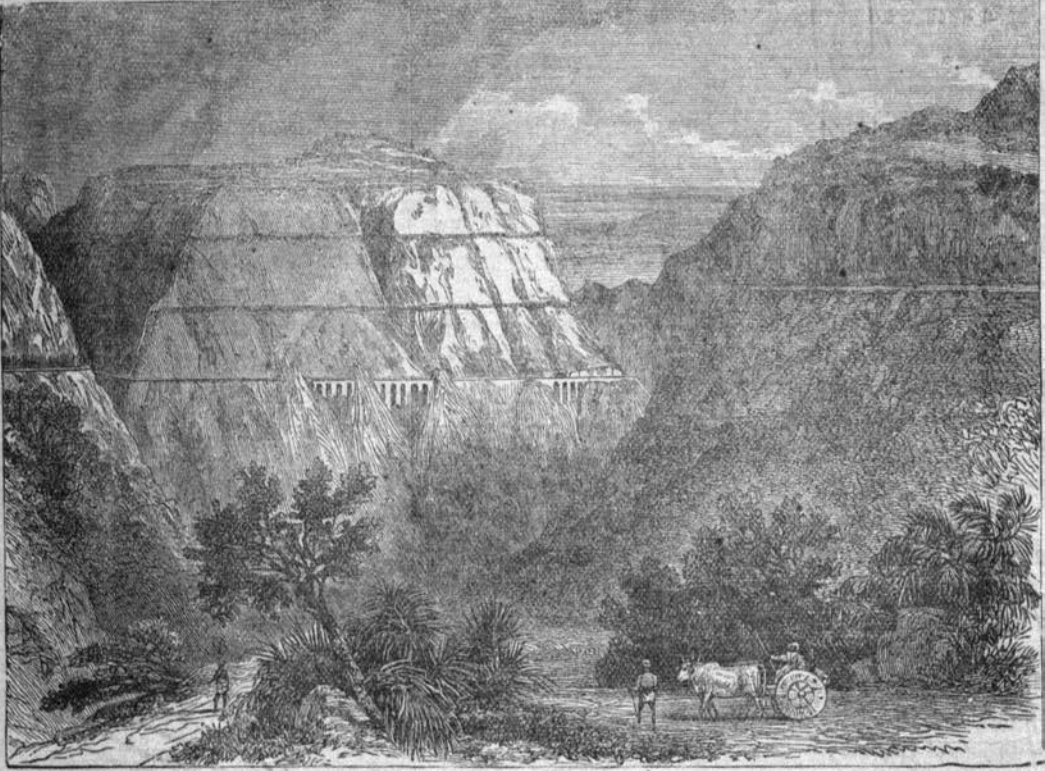
ভোর ঘাট রেল-ওয়ে।

করিত না, তাহারা তাহা ছারখার করিয়া দিত। মহারাষ্ট্রীয় রণবাদ্য শুনিবামাত্র কৃষক চাউলের ছালা কাঁধে করিয়া ও পয়সা কড়ি কোমরে বান্ধিয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া পর্ব্বতে বা জঙ্গলে পলাইয়া যাইত। অনেক অঞ্চলের লোকে বার্ষিক কিছু কিছু টাকা দিয়া তবে শস্য কাটিতে পাইত। এমন কি, যে তালপাতার সিপাহি দিল্লীশ্বর হইয়াছিলেন, তিনিও কর দিতেন। এক জন মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি দিল্লীর এত নিকটে শিবির স্থাপন করেন যে, রাজবাটী হইতে শিবিরস্থ প্রদীপ দৃষ্ট হইত। আর এক জন নায়ক অগণ্য অশ্বারোহী লইয়া বঙ্গদেশের নানা অঞ্চল প্রতি বৎসর লুঠ করিত।”

১৮১৭ সালে প্রধান মহারাষ্ট্রীয় রাজা বাজি রাও পুনাস্থ ইংরাজ রেসিডেন্সি আক্রমণ করেন, কিন্তু কিছু করিতে পারেন নাই। পরে তিনি ইংরাজদিগের হাতে আত্মসমর্পণ করেন। কানপুরের নিকট বিথুর নামক স্থানে বার্ষিক আট লক্ষ টাকা পেন্সন দিয়া ইংরাজেরা তাঁহাকে রাখিয়া দেন। ইঁহারই পোষ্যপুত্র নানাসাহেব কানপুরের হত্যাকাণ্ডের মূল।

বোম্বাই হইতে রেলপথ।

গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলার রেলওয়ে। এই রেলপথ বোম্বাই হইতে ১৭ ক্রোশ গিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার উত্তর শাখা কলিকাতার ও দক্ষিণ শাখা মান্দ্রাজের দিকে গিয়াছে। এই দুই লাইনই ঘাট পর্ব্বতের অন্যূন ১৩৩২ হাত উচ্চে উঠিয়া আবার নীচে নামিয়াছে। অনেক স্থলে বক্র হইয়া উচ্চ পাহাড়ের

গা বাহিয়া গিয়াছে, এক দিকে মাথার উপর পাহাড়, অপর দিকে খড, তাহা দিয়া বেগে জলস্রোত বহিতেছে।

পুনা বোম্বাই হইতে ৬০ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে। ইহা দাক্ষিণাত্যের সৈনিক রাজধানী, বোম্বাইয়ের গবর্ণর ও দলবল সহ বৎসরের মধ্যে কএক মাস এখানে গিয়া বাস করেন। এই স্থান সমুদ্র হইতে ১২৩২ হাত উচ্চ ও মুতা নদীর তীরবর্ত্তী। এখানকার জল বায়ু স্বাস্থ্যকর ও মনোরম্য। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য তামা, পিত্তল, কাঁসা, লোহা ও মাটীর জিনিস এবং কাপড়।*

১৬০৪ সালে প্রথম বার ইতিহাসে পুনার উল্লেখ দেখিতে পাই। এই সালে আমেদনগরের সুলতান শিবজির পিতামহ মালোজিকে পুনা দান করেন। ১৮১৮ সালে বাজিরাও পেশোয়া সিংহাসনচ্যুত হইলে পুনা নগরে ইংরাজদের প্রধান সৈনিকাবাস স্থাপিত হয়।

নিবাসী সংখ্যা ১৬০,০০০। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে এটী দ্বিতীয় নগর।

আমেদনগর বোম্বাই হইতে ৬৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী ও সিনা নদীতীরে স্থাপিত। বাহমানি রাজ্যের রাজ কর্ম্মচারী আহম্মদ নিজাম সাহ ১৪৯৪ সালে এই নগর স্থাপিত করেন। বিঙ্গার নামে একটি অতি পুরাতন নগর ছিল, সেই স্থানে বর্ত্তমান নগর স্থাপিত হইয়াছে। নগরের চারিদিকে যে মাটির দেওয়াল আছে লোকে বলে, ১৫৬২ সালে তাহা নির্ম্মিত হয়। ১৬৩৬ সালে সাজাহান উক্ত নগর সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করেন। ১৭৫৯ সালে মোগল সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক এই নগর পেশোয়ার হাতে সমর্পণ করেন। ১৮০৩ সালে ইংরাজ সেনাপতি ওয়েলেস্লি এই নগর আক্রমণ করিয়া দুই বৎসর পরে দখল করেন। ইহার অনতিবিলম্বে নগরটি পুনরায় পেশোয়াকে দত্ত হয়, কিন্তু ১৮০৩ সালে আবার ইংরাজেরা দখল করেন। নগরের লোকসংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার।

গোদাবরী তীরস্থ নাসিকের মন্দির।

নাসিক, বিখ্যাত হিন্দু তীর্থ স্থান, গোদাবরী নদীর উৎপত্তি স্থান হইতে ১৫ ক্রোশ দূরে নদীর উভয় তীরে স্থাপিত।
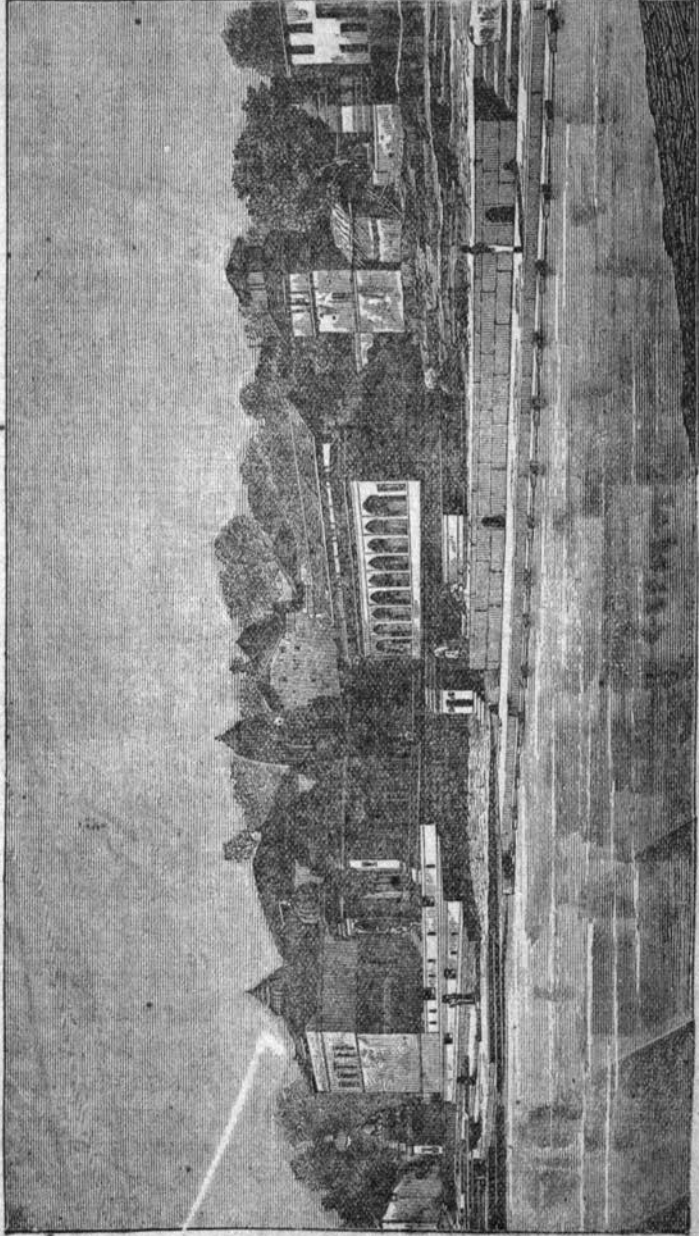
হিন্দুদিগকে ভুলাইবার জন্য ব্রাহ্মণেরা গোদাবরী নদীর বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য গল্প বলিয়া থাকেন। এই নদীর মাহাত্ম্য রামচন্দ্র সর্ব্বপ্রথমে গৌতম ঋষির নিকট প্রকাশ করেন। লোকের বিশ্বাস এই যে, গঙ্গার উৎপত্তি স্থানে জন্ম-গ্রহণ করিয়া মাটির নীচ দিয়া গোদাবরী নদী প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। নদীর সকল স্থানই পবিত্র। ইহার জলে স্নান করিলে অতি গুরুতর পাপও স্খালিত হয়। প্রতি দ্বাদশ বৎসরে এই নদীর তীরে পুষ্কর নামে এক উৎসব হয়।

নর্ম্মদা নদীর মাহাত্ম্য আরও অধিক। পশ্চিমবাহিনী হইয়া এই নদী কাম্বে উপসাগরে পতিত হইয়াছে। কথিত আছে, রুদ্র নামক দেবতার ঘর্ম্ম হইতে এই নদীর উৎপত্তি। ব্রাহ্মণেরা বলেন, এক বার গঙ্গাস্নান করিলে জন্মার্জ্জিত সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়, কিন্তু নর্ম্মদা নদীর দর্শন মাত্রেই সমস্ত পাপ দূর হইয়া যায়। আবার গঙ্গার উত্তর তীরে কেবল মৃতদেহ দাহন করার বিধি আছে, কিন্তু নর্ম্মদার উভয় তীরেই মৃতদেহ দাহন করা প্রশস্ত।

মধ্য-ভারতবর্ষ।

মধ্য-ভারতবর্ষে ৭১ টী বৃটিশ রক্ষিত ছোট ছোট রাজ্য আছে। এই অঞ্চল উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা আয়তনে বড়। বড় লাটের এক জন এজেণ্ট এই সকল রাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক। তিনি ইন্দোর নগরে বাস করেন। এই দেশের ক্ষেত্রপরিমাণ প্রায় ৪৫০০০ বর্গ ক্রোশ। লোক সংখ্যা এক কোটি।

প্রধান প্রধান দেশীয় রাজার রাজ্য এই ;— রেওয়া এবং বুন্দেলখণ্ড পশ্চিম দিকে ; গোয়ালিয়র রাজ্য উত্তর দিকে ; ভূপাল ও ইন্দোর দক্ষিণ দিকে। কেবল তিনটী প্রধান রাজ্যের বিবরণ লিখিতেছি।—

মহারাজা সিন্ধিয়ার অধীন গোয়ালিয়র রাজ্য মধ্য-ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড়। চম্বল ও নর্ম্মদা নদীর মধ্যবর্ত্তী ছিন্ন ভিন্ন জেলাগুলি এই রাজ্যের অন্তর্গত। ইহা মহীশূর অপেক্ষা বড়। লোক সংখ্যা ২৫ লক্ষ।

উত্তরাঞ্চলে অনেক স্থান বড় গরম, পাহাড় এবং বালুকাময় ; দক্ষিণ অঞ্চল ঠাণ্ডা ও উর্ব্বরা।

১৭৫০ সালে পেশোয়ার মৃত্যু হয়, তাঁহার পাদুকা-বাহকের নাম রজনী সিন্ধিয়া। এই ব্যক্তি গোয়ালিয়র রাজ্যের ও সিন্ধিয়া রাজবংশের স্থাপনকর্ত্তা। মধ্য-ভারতে এই ব্যক্তি বিস্তীর্ণ রাজ্য স্থাপন করিয়া ছিলেন। কিন্তু বৃটিশ সৈন্য দ্বারা বার বার পরাজিত হওয়াতে রাজ্যটী অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহার রাজধানীর নাম গোয়ালিয়র, ইহার আর এক নাম লস্কর। এখানে পাহাড়ের উপরে একটি বিখ্যাত দুর্গ আছে।

ভূতপূর্ব্ব সিন্ধিয়া সে কালের হিন্দুর ন্যায় অশিক্ষিত ছিলেন। তিনি সৈন্যসামন্ত বড় ভাল বাসিতেন। রাজকর্ম্মচারীরা বেতন পাইতেন না এবং দেশের রাস্তা ঘাট ভাল ছিল না, কিন্তু মরণ কালে তিনি সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা রাখিয়া যান। বহুমূত্র রোগে কাতর হওয়াতে গণকেরা তাঁহাকে বিশেষ কোন নদীতে স্নান করিতে পরামর্শ দেন, সেই নদীতে স্নান করাতেই রাজার মৃত্যু আরও নিকট হয়। ভরসা করি, বর্ত্তমান সিন্ধিয়া সুশিক্ষিত হইবেন।

ইন্দোরের রাজ-ফটক।

ইন্দোর।

ইন্দোর রাজ্যভুক্ত জিলাগুলি নর্ম্মদা নদীর উভয় তীরে যেন ছড়াইয়া রহিয়াছে। ক্ষেত্রপরিমাণ ৪২০০ বর্গ ক্রোশ। নিবাসী সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। এদেশে অনেক পরিমাণে অহিফেণ জন্মে।

হুলকার রাজপরিবারের পত্তনকর্ত্তা ১৬৯৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সামান্য রায়ত মাত্র ছিলেন, কালক্রমে কার্য্যদক্ষ সর্দ্দার হইয়া উঠেন। ইহাঁর বংশীয় এক সেনাপতি অনেক অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আসিয়া যমুনার তীরবর্ত্তী অঞ্চল ছারখার করিয়া ফেলেন ; কিন্তু অবশেষে ইংরাজ সেনাপতি লর্ড লেক্ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলাইয়া যান।
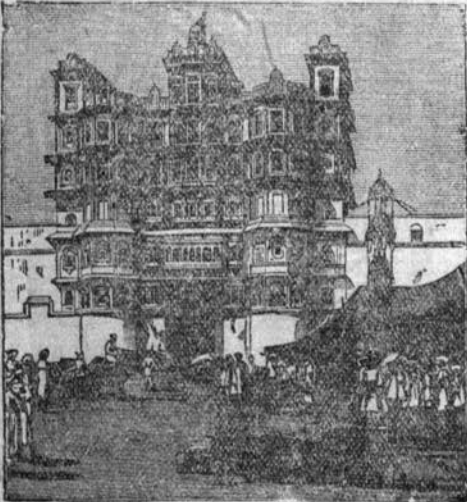
ভূতপূর্ব্ব হুলকার আত্মশ্লাঘিতা হেতু বিখ্যাত হইয়াছিলেন। দেশে অনেক কর বৃদ্ধি করিয়া ব্যবসাদারের মতন অর্থ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতেন।

ইন্দোরের দুই এক জন দেওয়ান বড় যোগ্য লোক ছিলেন, কিন্তু শাসনকার্য্যের উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হন নাই।

মধ্য-প্রদেশ।

নিজাম রাজ্য ও ছোট নাগপুরের মধ্য স্থলে মধ্য প্রদেশ, ইহার চারি দিকেই প্রায় দেশীয় রাজগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য। ক্ষেত্রপরিমাণ প্রায় ৪২,০০০ হাজার বর্গ ক্রোশ। লোক সংখ্যা এক কোটি, তন্মধ্যে ২০ লক্ষ গন্দ ও অন্যান্য আদিম নিবাসী।

আদিম নিবাসীরা জঙ্গলি ও অসভ্য ছিল। পরে গন্দেরা আসিয়া এই দেশে বাস করে। ইহাদের ভাষা দাক্ষিণাত্য ভাষা-পরিবারভুক্ত। গন্দ শব্দের অর্থ হয় ত পাহাড়িয়া, এই জন্য দেশটীকে গন্দোয়ানা বলা যাইত। ইহাদের লিখিত ভাষা নাই। ইহারা ভূতের উপাসক। এ অঞ্চলের গম, ধান ও তুলা বিখ্যাত। রাজধানীর নাম নাগপুর।

হায়দ্রাবাদ বা নিজাম রাজ্য।

ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অধীনে যত দেশীয় রাজাদের রাজ্য আছে, তন্মধ্যে নিজাম রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা বড়, ও প্রধান। এই বিশাল রাজ্যের উত্তরপূর্ব্ব সীমানা মধ্য প্রদেশ; দক্ষিণ সীমানা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি; ও পশ্চিম সীমানা বোম্বাই প্রেসিডেন্সি। নিজাম রাজ্য আয়তনে মধ্য প্রদেশের সমান। নিবাসী সংখ্যা প্রায় এক কোটি দেড় লক্ষ। পূর্ব্বাঞ্চলের নিবাসীরা প্রায়ই জাতিতে তৈলঙ্গী, ও পশ্চিমাঞ্চলের প্রায়ই মহারাষ্ট্রীয়।

আরঙ্গজিবের মৃত্যুর পর দাক্ষিণাত্যের সুবাদার আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা ও মোগল বাদশাকে কর দেওয়া বন্ধ করেন। নিজাম সেই সুবাদারের বংশজ। অনতি দীর্ঘকাল পূর্ব্বে এ দেশের শাসনকার্য্যের বড় বিশৃঙ্খলা ছিল। ভূতপূর্ব্ব স্যর সালার জঙ্গ বড় বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় শাসনকার্য্যের অনেক উন্নতিকর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ক্রমেই এক্ষণে উন্নতি হইতেছে।

হায়দ্রাবাদ ইহার রাজধানী; কৃষ্ণার এক শাখা-নদীর তীরে স্থিত।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি।

ভারত প্রায়দ্বীপের দক্ষিণাংশ ও বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম তীরবর্ত্তী দীর্ঘ ভূমিখণ্ড মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত। ইহার তিন দিকে সমুদ্র। ইহার ক্ষেত্রপরিমাণ ৬৮০১০ বর্গ ক্রোশ, সুতরাং বোম্বাই প্রেসিডেন্সি অপেক্ষা বড়। দক্ষিণ পশ্চিম কূলবর্ত্তী অনেক স্থানের ভূমি কঠিন ও ত্রিবাংকুর রাজ্যের অন্তর্গত।

দাক্ষিণাত্যের সমভূমি ও ঘাট পর্ব্বত এবং সমুদ্র ইহার মধ্যবর্ত্তি জিলা সকল মান্দ্রাজের অন্তর্গত। দক্ষিণ ভাগ ব্যতীত পূর্ব্ব উপকূলের অধিকাংশ স্থান সমতল। পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাট পর্ব্বত এই দেশের প্রধান পর্ব্বতমালা, নীল গিরির সহিত দক্ষিণ দিকে সংযুক্ত।

গোদাবরী, কৃষ্ণা এবং কাবেরী, এই তিনটী এ দেশের প্রধান নদী, এই তিনটিই বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে।

দেশের জলবায়ু, বিশেষতঃ পূর্ব্ব উপকূলে, বড় গরম।

উত্তর ভারতবর্ষে যেমন অত্যন্ত শীত ও অত্যন্ত গরম হয়, মান্দ্রাজে তেমন নয়। দাক্ষিণাত্যের সমতল ভূমিতে বৃষ্টিপাত বড় কম, কিন্তু পশ্চিম উপকূলে যথেষ্ট বৃষ্টি হয়।

লোকসংখ্যা প্রায় তিন কোটি ষাটি লক্ষ। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে তৈলঙ্গী, দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রদেশে কর্ণাটিকা, দক্ষিণ পশ্চিম প্রদেশে মালবারী ভাষা প্রচলিত। এই সকল ভাষাই দ্রাবিড়ীয় অথবা দাক্ষিণাত্য ভাষা-পরিবার-ভুক্ত। দেশের অধিকাংশ লোক হিন্দু; ছয় জনের মধ্যে এক জনমাত্র মুসলমান। এ দেশে খ্রীষ্টীয়ানের সংখ্যা যেমন অধিক, ভারতবর্ষের আর কোন অংশে তেমন নয়।

মান্দ্রাজ নগর।

এই প্রেসিডেন্সির রাজধানী মান্দ্রাজ, সমুদ্রকূলস্থিত; দক্ষিণ ভারতবর্ষে এত বড় নগর আর নাই। নামটির অর্থ ঠিক করা যায় না। দেশীয় লোকেরা ইহাকে চীনাপত্তনম বলে, ইহার অর্থ, চীনাপার নগর, এই নগর পত্তনকালে যে রাজা ছিলেন, চীনাপা তাঁহার ভ্রাতা। এক্ষণে যে স্থানে মান্দ্রাজ নগর স্থিত, ১৬৩৯ সালে দে নামে এক জন

ইংরাজ চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে ঐ স্থান প্রাপ্ত হন। পরে ইংরাজেরা সামান্য রকম গড়বন্দি করিয়া উক্ত স্থানে এক কুঠী নির্ম্মাণ করাতে দেশীয় লোকেরা তাহার চারি দিকে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করে। ইংরাজেরা ইহার নাম রাখেন ব্ল্যাক টাউন অর্থাৎ কৃষ্ণনগর। ১৬৯০ সালে চারি দিকে মাটির প্রাচীর দিয়া এই নগর রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হয়। ১৭৪১ সালে মহারাষ্ট্রীয়েরা এই নগর আক্রমণ করে, কিন্তু দখল করিতে পারে নাই। ১৭৪৬ সালে ইংরাজেরা এই নগর আরও বাড়াইয়া গড়বন্দি করেন। কিন্তু ১৭৫৮ সালে ফরাসিরা নগরটি দখল করেন।

ইহার দুই বৎসর পরে ইংরাজেরা পুনরায় ইহা প্রাপ্ত হয়েন। ১৭৫৮ সালে ফরাশিরা আবার এই নগর অবরোধ করেন, কিন্তু ইংরাজদিগের রণতরির বহর আসিয়া পড়াতে পলাইয়া যান। এখানকার দুর্গ এক্ষণে যে রূপ দেখ, ১৭৮৭ সালে ইহার অধিকাংশ নির্ম্মিত হয়। তখনকার ইংলণ্ডের রাজা জর্জ্জের নামানুসারে দুর্গের নাম সেন্ট জর্জ্জ রাখা হয়।

সাধারণ দৃশ্য।

সমুদ্র হইতে দেখিলে, দুর্গ, সৌদাগরদিগের কয়েকটি কার্য্যালয় এবং কতকগুলি বাটী প্রথমে চক্ষে পড়ে; স্থানটি এত নিম্ন যে, প্রথম সারির বাটীগুলি সম্মুখে থাকাতে নগরের অবশিষ্ট অংশ প্রায় দেখা যায় না। সাবেক নগরের ঘেরা প্রাচীরের মধ্যে ব্ল্যাক টাউন। ইহার বাটীগুলি বড় ঘন ও বিশৃঙ্খল এবং ইহাতে অনেক লোক বাস করে। ইহার সহরতলি কুম নদীর দেড় ক্রোশ উত্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানে লোকের বসতি বড় ঘন। নগরের এই অংশ

মান্দ্রাজী কাঠের ভেলা।

কারবারের স্থল। পোতাশ্রয় ও বাঁধ ব্ল্যাক টাউনের সমুদ্রকূল। পূর্ব্বে এখানে কেবল একটা বাঁক ছিল, জাহাজ সকল নগর হইতে অনেক দূরে নঙ্গর ফেলিয়া থাকিত। আরোহীরা নৌকা করিয়া নাবিত। এই নৌকাগুলি বড় বড়, তক্তাগুলি দড়ি দিয়া বাঁধা, সুতরাং ঢেউ লাগিলে ভাঙ্গিয়া যাইত না। মান্দ্রাজের জেলেরা এক রকম ভেলায় করিয়া সমুদ্রে মৎস্য ধরে। ব্ল্যাক টাউনের দক্ষিণে কতকটা মাঠ আছে, তাহার সম্মুখে প্রায় এক ক্রোশ পরিমাণ সমুদ্র। এই মাঠে দুর্গ, লাট সাহেবের বাটী এবং আরও কতকগুলি সুন্দর বাটী আছে। আরও দক্ষিণে ত্রিপ্লিকেন, এখানে নবাবের অট্টালিকা ও সেন্ট থোমা। ১৫০৪ সালে পর্ত্তুগিজেরা সেন্ট থোমা গড়বন্দি এবং ১৭৪৯ সালে ইংরাজেরা অধিকার করেন।

১৪ বর্গক্রোশ ভূমি ব্যাপিয়া নগরটী স্থাপিত, ইহাতে ২৩টী গ্রাম আছে, আবার অনেক ভূমিতে লোকে কৃষিকার্য্য করে। নগরের প্রধান রাস্তা মাউন্ট রোড, ১৭৯৫ সালে এই রাস্তা প্রস্তুত হয়। দুর্গ হইতে সেন্ট থোমার

জাহাজ-ঘাট।
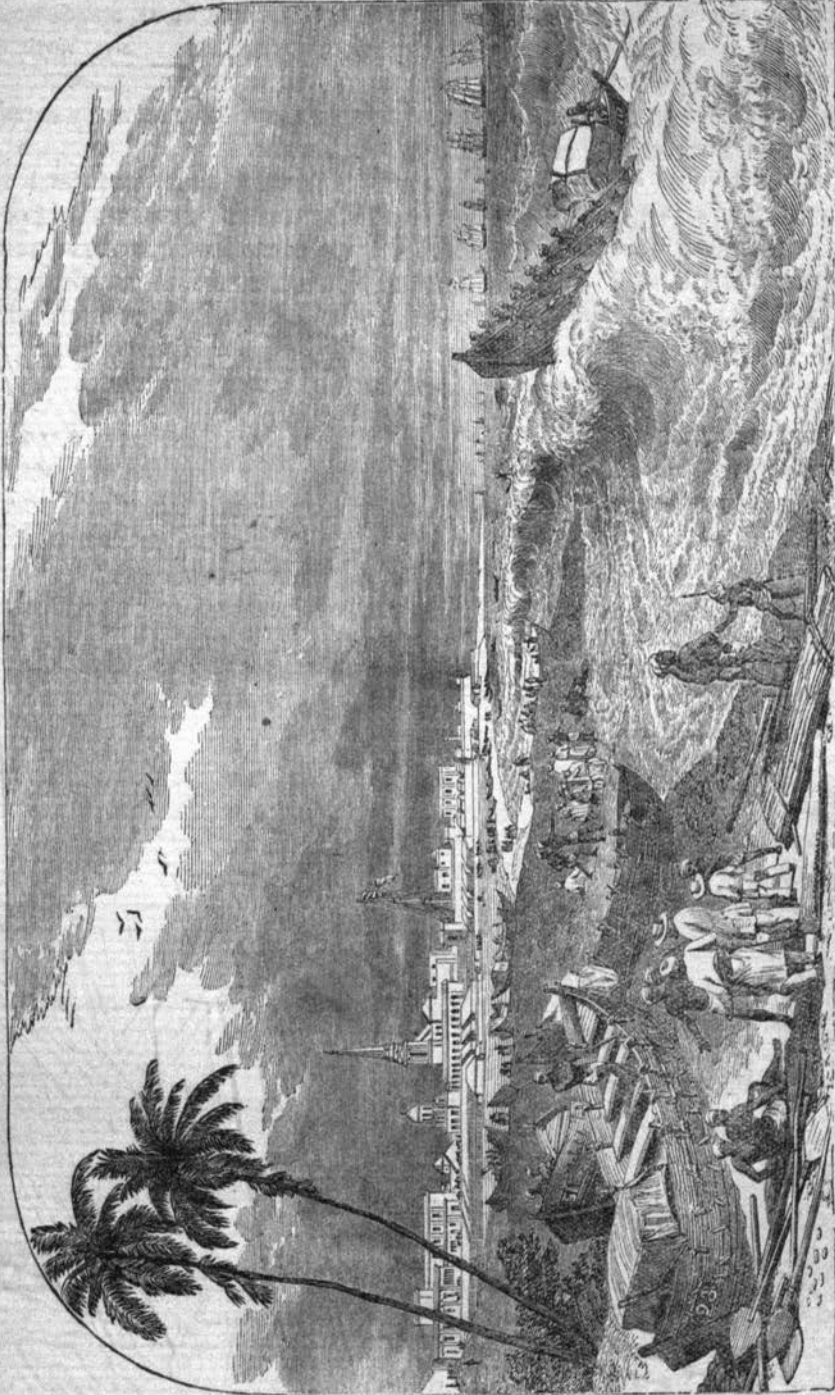
কাছা-কাছি পর্য্যন্ত এই পথে যাওয়া যায়। নগরের কোন কোন অংশে ইংরাজদিগের স্থন্দর স্থন্দর বাসবাটী আছে, তাহার হাতা খুব বড় বড়। নগরের মধ্য দিয়া কুম নদী গিয়াছে, কিন্তু বারমাস নৌকা চলে না।

এখানে গ্রীষ্ম বড় বেশি, কিন্তু সমুদ্রের বাতাস স্নিগ্ধকর। বেগে ঝড় বহিলে বাঁকের মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা। ১৭৪৬ সালে ১২০০ লোকসমেত ফরাশিবহরের পাঁচখানি জাহাজ ডুবিয়া যায়। ১৮৭২ সালে ইংরাজদের নয় খানি জাহাজ ঝড়ে ডাঙ্গায় তুলিয়া ফেলে।

মান্দ্রাজ নগরের লোক সংখ্যা প্রায় সাড়ে চারি লক্ষ। ভারতবর্ষের মধ্যে এটী তৃতীয় নগর। এখানকার বাণিজ্য ব্যবসায় স্থানীয় কোন উৎপন্ন বা প্রস্তুত কোন দ্রব্যের উপর নির্ভর করে না।

মান্দ্রাজের লোকদিগকে সচরাচর অন্ধকারে মগ্ন লোক বলা যায়। কথাটি অনেক বিষয়ে সঙ্গত বটে। থিয়ওসফি নামক বিলাতি বৌধ্যধর্ম্মের পাণ্ডারা মান্দ্রাজকে আপনাদের ধর্ম্ম মতের কাশী বা কেন্দ্র স্থল রূপে মনোনীত করিয়াছেন। কিন্তু সুখের বিষয় এই, কৃষ্ণপক্ষের সঙ্গে সঙ্গে শুক্লপক্ষও আছে। মান্দ্রাজের সমাজ সংস্কারক দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাও পারসি মালাবারি এবং বাঙ্গালি বিদ্যাসাগরের সহিত একাসনে বসিবার যোগ্য।

মান্দ্রাজের খ্রীষ্টীয়ান কলেজের তুল্য বড় ও সুদক্ষ্য মিশনরি কলেজ ভারতবর্ষে আর নাই বলিলেই হয়। ডাক্তার মিলার ইহার অধ্যক্ষ।

তৈলঙ্গ দেশ।

ভারত উপদ্বীপের মধ্য প্রদেশে এবং মান্দ্রাজের উত্তর হইতে চিকাকোল পর্য্যন্ত তৈলঙ্গী ভাষা প্রচলিত। কিন্তু চিকাকোল পর্য্যন্ত গিয়াই ভাষাটি ক্রমে উড়িয়া হইয়া পড়িয়াছে। সমৃদ্ধি বিষয়ে এই ভাষা প্রায় পাণ্ড্যভাষার তুল্য, কিন্তু পাণ্ড্য অপেক্ষা ইহার মাধুর্য্য অধিক। বিদেশীয় লোকে ইহাকে ভারতের ইতালি ভাষা বলে। এক কোটি সত্তর লক্ষ লোকে এই ভাষার ব্যবহার করে।

তৈলঙ্গী ভাষাকে আবার তেলগু ভাষাও বলে, ইহাই সংস্কৃত গ্রন্থকারদিগের অন্ধ্র ভাষা। কথিত আছে যে, উজ্জয়িনী দেশের সুবিখ্যাত রাজা বিক্রমাদিত্য অন্ধ্ররাজ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার অব্দ ৫৮ খ্রীঃ পূঃ, এখনও সর্ব্ববিদিত। এই দেশের প্রাথমিক ইতিহাস অন্ধকারে আবৃত। প্রাচীন কালের রাজধানীর নাম উরঙ্গল, ১৩০৯ সালে মুসলমানেরা এই নগর অধিকার করিলেও কিছু দিন পরে হিন্দুরা পুনরায় দখল করেন। ১৫১২ হইতে ১৫৪৯ সালের মধ্যে হিন্দু রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ গলকণ্ডা রাজ্যভুক্ত হয়। ১৭৬৫ সালে ইংরাজেরা সমুদ্রকূলবর্ত্তী প্রদেশ গুলি নিজামের নিকট হইতে গ্রহণ করেন।
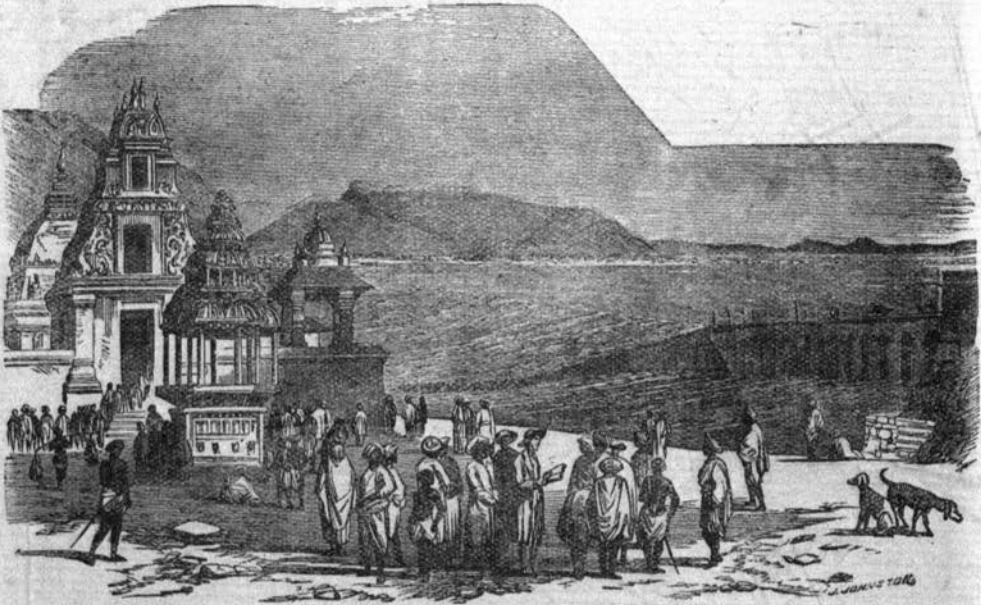
বেজবাদা।

এ দেশের প্রধান নদী দুটী—গোদাবরী ও কৃষ্ণা। পূর্ব্বে এই দুটি নদী দিয়া রাশি রাশি জল নিষ্ফলে বঙ্গোপসাগরে গিয়া পড়িত। এক্ষণে নদীর মধ্যে বাঁধ বাঁধিয়া জল ধরিয়া রাখিয়া, সেই জল কাটা খাল দিয়া

নানা দিকে চালাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে এক্ষণে ২৫ লক্ষ বিঘা জমি আবাদ হওয়াতে বার্ষিক অন্যূন এক কোটি টাকার শস্য জন্মে।

এই ছবিতে কৃষ্ণা নদীর বাঁধ চিত্রিত হইয়াছে।

সমুদ্রকূলবর্ত্তী কয়েকটি নগরের বিবরণ লিখিতেছি।

মস্থলিপত্তন মান্দ্রাজের উত্তর পূর্ব্ব দিকে এক শত ক্রোশ দূরে। এটি সামুদ্রিক বন্দর, ইহার নিকটেই কৃষ্ণা নদীর সাগরসঙ্গম। ১৬২০ সালে এই স্থানে ও ১৬৩৯ সালে মান্দ্রাজে ইংরাজেরা প্রথম বসতি করেন।

কোকনদা—এটিও সামুদ্রিক বন্দর, গোদাবরী নদীর উত্তর মুখের নিকটে স্থাপিত।

গোদাবরী নদীর উত্তরে বিশাখাপত্তন জিলা, ইহাতে অনেক জমিদারী আছে।

বিজয়ন গ্রামের মহারাজার জমিদারী সর্ব্বাপেক্ষা বড়। এই জিলার প্রধান নগর বিশাখাপত্তন, সমুদ্রকূলে স্থিত। মহিষের শৃঙ্গ ও সজারুর কাঁটার কারুকার্য্যযুক্ত দ্রব্য হেতু এই স্থান বিখ্যাত।

পাণ্ড্য দেশ।

কর্ণাটের প্রকাণ্ড সমভূমি পাণ্ড্য জাতির বাসস্থান। মান্দ্রাজ নগর হইতে পুলিকট দশ ক্রোশ উত্তরে। এই স্থান হইতে উক্ত সমভূমি সমুদ্রকূল দিয়া প্রায় ত্রিবেন্দ্রম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার পশ্চিম সীমানা ঘাট পর্ব্বত। সিংহল দ্বীপের উত্তরাঞ্চলের লোকেরাও পাণ্ড্য ভাষা কহে। প্রায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ লোক এই ভাষাবাদী।

কাবেরীর জলপ্রপাত।

পাণ্ড্য দেশে দুইটী প্রাচীন রাজ্য ছিল। উত্তরাঞ্চলের চোলা রাজ্যের রাজধানী কাঞ্জিবিরাম; আর দক্ষিণাঞ্চলস্থ পন্দ্যন রাজ্যের রাজধানী মাদুরা।

কএকটী প্রধান নগরের বিবরণ লিখিতেছি।

কাঞ্জিবিরাম বা কাঞ্চিপুর মান্দ্রাজের ২৩ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে। ভারতবর্ষে যে সাতটী পুণ্যস্থান আছে, এটী তাহার অন্যতর। এই জন্য ইহাকে "দক্ষিণের কাশী" বলা যায়। খ্রীষ্টীয় অব্দের সপ্তম শতাব্দীতে এই নগর বৌদ্ধদিগের কেন্দ্রস্থল ছিল। পরশতাব্দীতে জৈন মতাবলম্বিদিগের প্রাদুর্ভাব হয়। নগরের ইতস্ততঃ জৈন ধর্ম্মের চিহ্ন আজি পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পরেই হিন্দুদিগের প্রাদুর্ভাব হয়। ১৫০৯ সালে কৃষ্ণরায় দুটী বড় মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ১৬৪৪ সালে বিজয়নগরস্থ রাজবংশের পতন হইলে, নগরটী গলকণ্ডার রাজাদিগের হস্তগত হয়, পরে মুসলমানদিগের হাত দিয়া, আরকটের নবাবের রাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

তাঞ্জোর মান্দ্রাজ হইতে ১০৯ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে, কাবেরী নদীর ব-দ্বীপে স্থাপিত; দক্ষিণ ভারতবর্ষে এই ব-দ্বীপের ন্যায় উর্ব্বরা স্থান আর নাই। চোলা রাজবংশের এই খানে শেষ রাজধানী ছিল, এবং বিজয়নগরের এক জন নাএক ইহার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৬৭৮ সালে শিবজির ভ্রাতা ও তাঞ্জোর রাজবংশের পত্তনকর্ত্তা বেনকাজি এই নগর অধিকার করেন। ১৭৭৯ সালে রাজা এই নগরটী ও তন্নিকটবর্ত্তী কএকটী গ্রাম নিজ দখলে রাখিয়া অবশিষ্ট ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করেন। ১৮৫৫ সালে উক্ত রাজা নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করাতে সমস্তই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অধিকার করিয়া লইয়াছেন।

মহাদেবের প্রকাণ্ড মন্দির ও মন্দিরের সম্মুখস্থ বৃহৎ প্রস্তরময় ষাঁড় এখানকার বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিষ। পরে দক্ষিণ ভারতের মন্দির সমূহের বিবরণ লিখিত হইবে।

ত্রিচিনোপলি কাবেরী নদীর তীরে ও তাঞ্জোরের ১৫ ক্রোশ পশ্চিমে। এটি এই প্রেসিডেন্সির দ্বিতীয় নগর; এখানে অনেক সৈন্য থাকে। দুর্গের ভিতরে ত্রিচিনোপলি শৈল, সমভূমির মধ্য স্থলে একবারে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে, ইহার উচ্চতা ১৮২ হাত। এই শৈলশিখরে উঠিবার জন্য পাহাড়ের গায়ে পাথর কাটিয়া সিঁড়ি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার কতকটা অনাবৃত। ইহার উপরে দুইটী মন্দির আছে, একটী শিবের আর একটী গণেশের। প্রতিবৎসর কোন পর্ব্ব উপলক্ষে অনেক লোক এখানে সমবেত হয়। ১৮৪৯ সালে এক হুজুক উঠে, তাহাতে ২৫০ লোক হুড়া-হুড়ি করাতে মারা পড়ে।

এখানকার অলঙ্কার ও চুরুট বিখ্যাত। ইতিহাসেও ইহার নাম আছে। এই নগর অনেক বার শত্রুকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিল।

কাবেরী নদীতে ত্রিচিনোপলির নিকটে শ্রীরঙ্গম বলিয়া একটী দ্বীপ আছে, এই দ্বীপে বিষ্ণুর একটী বিখ্যাত মন্দির আছে। এত বড় মন্দির ভারতবর্ষে আর নাই।

মাদুরা মন্দিরের সিংহ দ্বার।

মাদুরা বৈগাই নদীর দক্ষিণ তীরে, মান্দ্রাজের দক্ষিণ পশ্চিমে, ১৭০ ক্রোশ দূরে। এটী ভারতের অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত নগর। খ্রীষ্ট জন্মের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে পাণ্ডাগণ এই নগরে থাকিয়া রাজ্যশাসন আরম্ভ করেন। খ্রীষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাঁহারা রাজত্ব করেন। কথিত আছে যে, শেষ পাণ্ড্য রাজা সুন্দর বা গুণ পাণ্ড্য জৈনদিগকে নির্ম্মূল এবং নিকটবর্ত্তী চোলা রাজ্য জয় করেন; কিন্তু উত্তরাঞ্চল হইতে কোন রাজা গিয়া তাঁহাকে পরাজয় করেন। অবশেষে এই প্রদেশ বিজয়নগরের বিশাল হিন্দু সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে নাএক বংশের পত্তন কর্ত্তা বিশ্বনাথ মাদুরার শাসনকর্ত্তা রূপে বিজয়নগর হইতে প্রেরিত হয়েন। কালক্রমে তাঁহার

তাঞ্জোরের শিব মন্দির।

ত্রিচিনাপলির পাহাড়।

মাদুরার মন্দির সংক্রান্ত সরোবর।

বংশধরেরা সৌভাগ্যশালী রাজা হয়েন। বিশ্বনাথ জীবিতকালে যুদ্ধকালে সৈন্যসামন্ত দিয়া সাহায্য করিবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া ৭২ জন উপরাজাকে দেশের নানা স্থানে ভূমিদান করেন। মাদুরার "পালিগার" বা "পাল্যকরণ দিগের" উৎপত্তির আদি বিবরণ এই। ইহাঁদের সন্তানেরা বিশ্বনাথদত্ত ভূমি এখনও ভোগ করিয়া আসিতেছেন। বিশ্বনাথের পরবর্ত্তী রাজগণের মধ্যে ত্রিমলই প্রধান; ইনি মাদুরার অনেক সুন্দর বাটী নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজ্যটী নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ১৭৪০ সালে মাদুরা চান্দা সাহেবের হস্তগত হয়। ১৮০১ সালে কর্ণাটের নবাব কর্ত্তৃক মাদুরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে প্রদত্ত হয়।
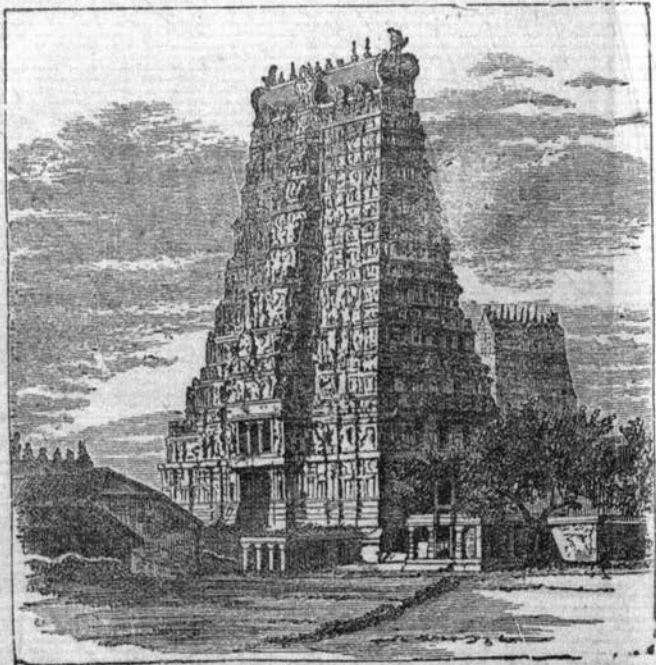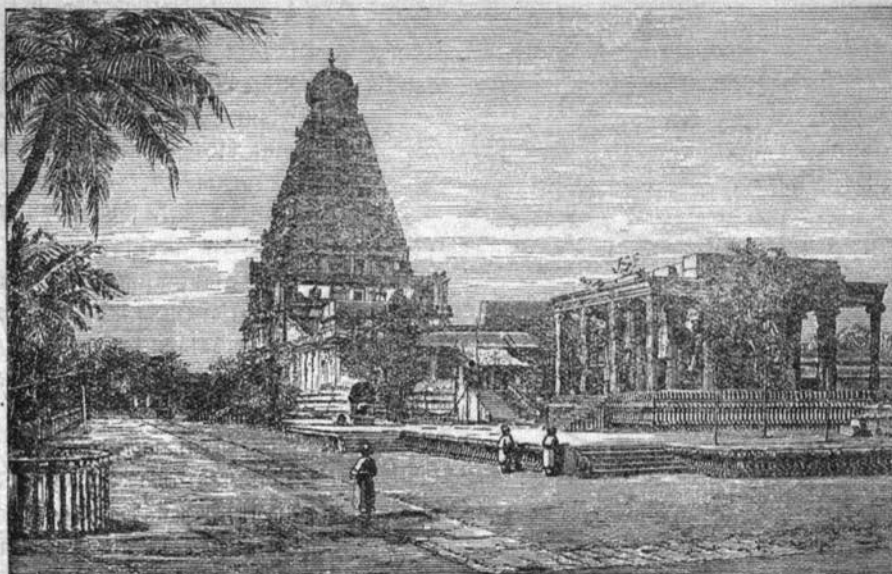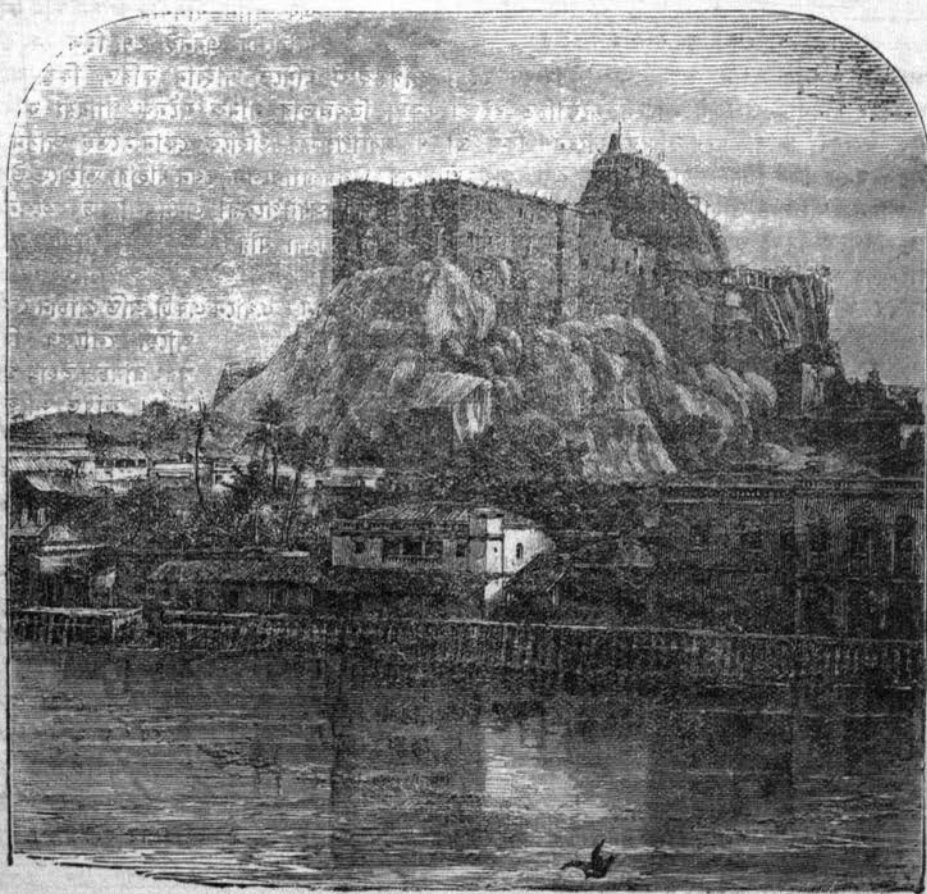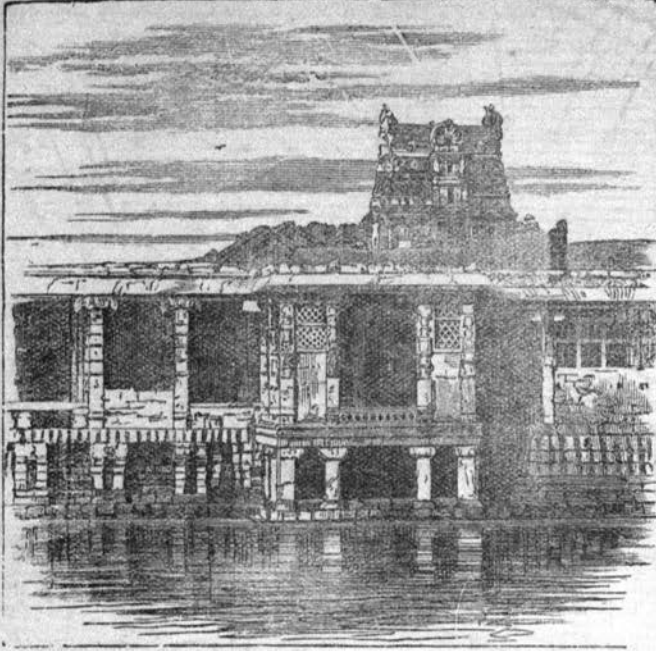
সে কালে মাদুরাতে একটী বিখ্যাত চতুষ্পাঠী ছিল। কথিত আছে যে, স্বয়ং মহাদেব এই চতুষ্পাঠীতে হীরকমণ্ডিত এক খানি বসিবার আসন দান করেন। আসনের এমনই গুণ ছিল যে, যোগ্য লোক আসিলে আসন খানি আপনা হইতে বিস্তৃত হইয়া আগন্তককে বসিতে আহ্বান করিত, কিন্তু অযোগ্য লোক আসিয়া বসিবার উপক্রম করিলে সঙ্কোচিত হইত। একদা ত্রিবল্লভার নামক জনৈক পারিয়া কবি এই চতুষ্পাঠীতে আসিয়া আসন গ্রহণ করিতে চাহেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ অধ্যাপকেরা তাঁহাকে কোন মতেই আসন দিতে চাহেন না। যখন ত্রিবল্লভার স্বরচিত কাব্য গ্রন্থ সেই আসনের উপর রাখিলেন, তখন যাঁহারা তাহাতে উপবিষ্ট ছিলেন, আসন আপনি তাঁহাদিগকে ঠেলিয়া দিল। ইহাতে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকেরা এমন লজ্জিত হইলেন যে, নিকটস্থ পুষ্করিণীতে গিয়া ডুবিয়া মরিলেন। এই ঘটনাতে চতুষ্পাঠী উঠিয়া যায়।

মহাদেবের প্রকাণ্ড মন্দির, ও ত্রিমুল নাএকের অট্টালিকা অতি বিখ্যাত।

রামেশ্বর অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ, মাদুরার দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে, এটী তীর্থ স্থান। এখানে একটী অতি প্রাচীন দেবালয় আছে, লোকের বিশ্বাস, স্বয়ং রামচন্দ্র ইহার স্থাপনকর্ত্তা। কথিত আছে যে, হনুমান পাথর আনিয়া, রামের সৈন্য লঙ্কায় লইয়া যাইবার জন্য পথ প্রস্তুত করেন, কিন্তু এক্ষণে ত এখানে পাথরের চিহ্ন নাই। কেবল বালি দেখা যায়।

"পাপ নাশ" জলপ্রপাত, তিনাভেলি।

মান্দ্রাজের সর্ব্ব দক্ষিণে তিনাভেলি প্রদেশ। এই দেশের লোকেরা সেকালে ভূতের পূজা করিত। এক্ষণে অনেক লোক খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করাতে এ প্রদেশ বিখ্যাত হইয়াছে।

চিত্রে যে পর্ব্বত দেখিতেছ, উহার নাম পশ্চিম-ঘাট পর্ব্বত; তিনাভেলি প্রদেশের এইটী অতি চমৎকার দৃশ্য।

কুমারিকা অন্তরীপ ভারতের সর্ব্ব দক্ষিণ টেঁক, এখানে কেবল বালি ও কৃষ্ণবর্ণ পাথর রহিয়াছে।

দক্ষিণ-ভারতবর্ষের মন্দির।

দক্ষিণ-ভারতবর্ষের মন্দিরের ন্যায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির উত্তর-ভারতবর্ষে কুত্রাপি নাই। এই মন্দির গুলির অধিকাংশই চতুষ্কোণ ও দীর্ঘাকার, এক এক দিকে পিরামিডের ন্যায় উচ্চ সিংহদ্বার। সকলের মধ্যস্থলে দেবালয়,
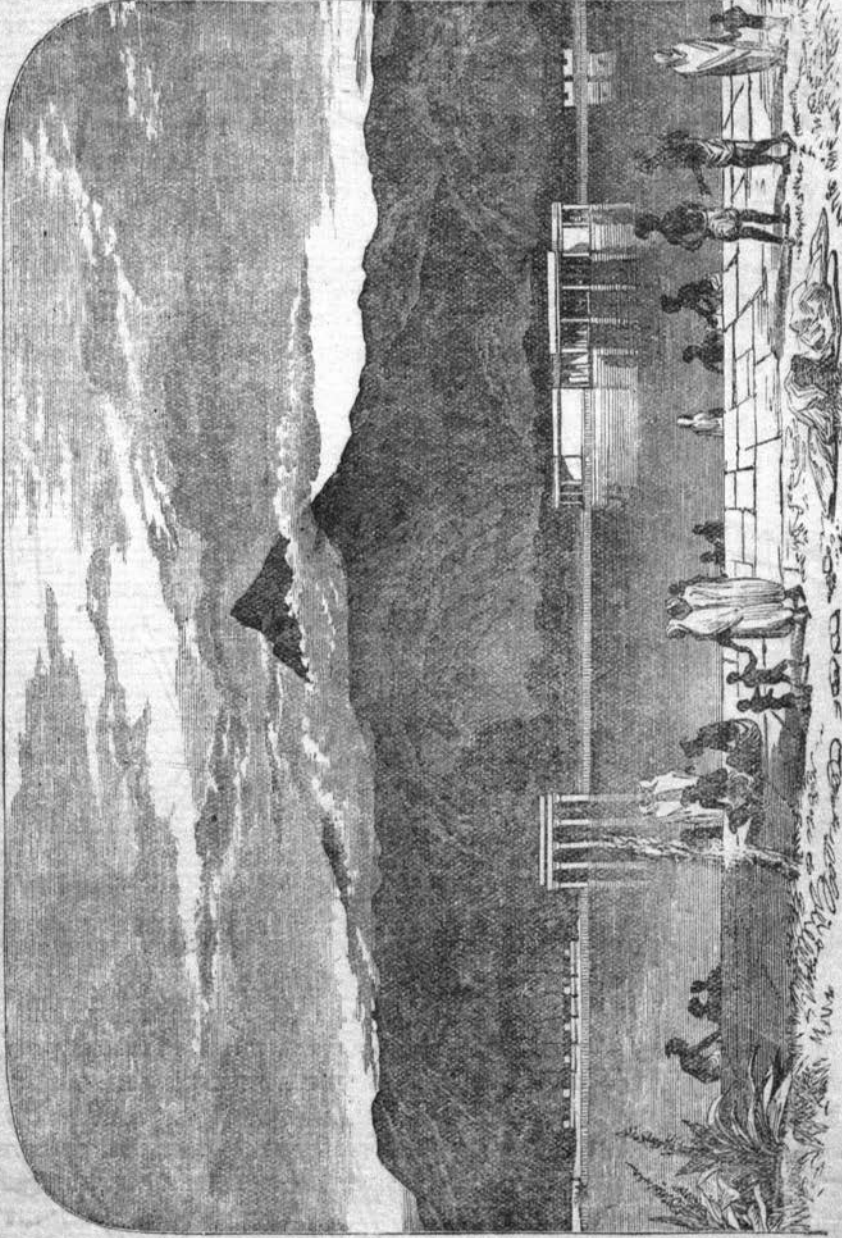
"দুধ সমুদ্র", শ্রীবিল্বপত্র, তিনাভেলি।

প্রকৃত মন্দিরটী বেশি বড় নহে, শ্রীরঙ্গম মন্দিরের সাতটী প্রকোষ্ঠ, একটীর মধ্যে আর একটী প্রকোষ্ঠ। দেবালয়ের পরেই যে প্রকোষ্ঠ, তাহাতে ১০০০ হাজার স্তম্ভ, ছয় হাত অন্তর এক একটী স্তম্ভ স্থাপিত, উচ্চতায় ৮ হাতের অধিক নহে, প্রস্তর খণ্ড জুড়িয়া স্তম্ভ নির্ম্মিত হয় নাই, এক একটী স্তম্ভ এক এক খণ্ড প্রস্তর, তাহার গাত্রে নানা কারুকার্য্য। আর চারিটী প্রকোষ্ঠে ব্রাহ্মণ, ভৃত্য, ও দেবালয় সম্পর্কীয় নানা লোক থাকে। তাহাদের সংখ্যা দশ হাজার। বাহিরের প্রকোষ্ঠে বাজার, নানা দ্রব্যের দোকান, আর যাত্রিরাও থাকে, ও আহার পায়। বাহিরের দেওয়ালটী সিকি ক্রোশের অধিক দীর্ঘ। সিংহদ্বারের চৌকাঠের বাজু পাথরের, দৈর্ঘ্য ২৭ হাত। ছাতের টালি ১৬ হাত লম্বা। প্রধান প্রধান সিংহদ্বারের চূড়ার নির্ম্মাণ কার্য্য আর শেষ হয় নাই।

দক্ষিণ ভারতবর্ষের দেবমন্দিরের একটা প্রথা অতি জঘন্য। দবিয়স্ এই উপলক্ষ্যে বলেন,

"পূজারিদিগের পরেই মন্দিরে এক দল নর্ত্তকী থাকে, তাহাদিগকে 'দেবদাসী' বলে। ব্যবসায়ের অনুরোধে তাহাদিগকে সকল জাতীয় লোককেই আলিঙ্গন করিতে হয়।

"শৈশব হইতে ইহারা এই জঘন্য কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হয়। ইহারা নানা জাতীয়া, অধিকাংশই সৎ কুলোদ্ভবা। অনেকে প্রথম কন্যা সন্তান দেবতাকে দান করিবে বলিয়া মানত করে, এবং কন্যা হইলে ভক্তিসহকারে তাহাকে দেবালয়ে রাখিয়া যায়। ইহা অতি পুণ্য কার্য্য বলিয়া গণিত। কন্যা কাজেই কুলটা হয়, কিন্তু তাহাতে তাহার মাতা পিতা বা আত্মীয়গণের কিছু আইসে যায় না।"
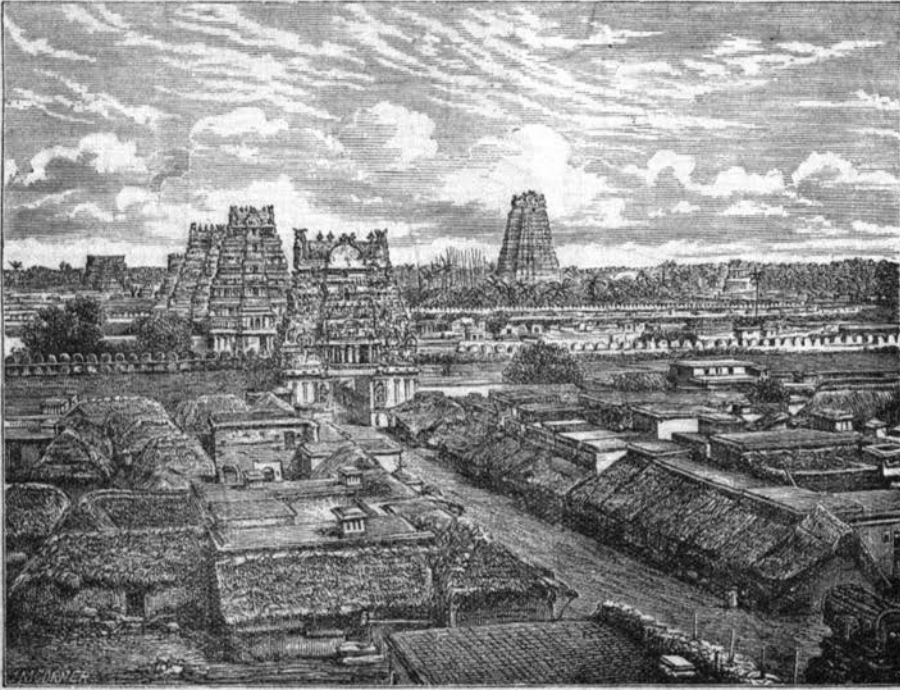
শ্রীরঙ্গ মন্দির।

১৮৮১ সালের তালিকা অনুসারে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ১১,৫৭৩ জন নর্ত্তকী ছিল। ইহা বড় দুঃখের বিষয়।

সে কালের গ্রিস দেশের বিষয়ে বিশপ লাইটফুট যাহা বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের পক্ষেও তাহা বিলক্ষণ খাটে,—

"কল্পনা করিয়া দেখ, যদি পার, এই আইন অনুমোদিত নির্লজ্জতা, এই প্রতিষ্ঠিত লম্পটতা ধর্ম্মের নামে প্রকাশ্যরূপে চলিতেছে; এ দিকে রাজনীতিজ্ঞ ও দেশহিতৈষী, দার্শনিক ও গ্রন্থকার, ইহাঁরা দেখিয়াও কিছু বলেন না; ইহা নিবারণের জন্য যত্ন মাত্র করেন না।"

হায়দর আলি ও টিপুর সমাধি— শ্রীরঙ্গ-পত্তন।

তুলা।
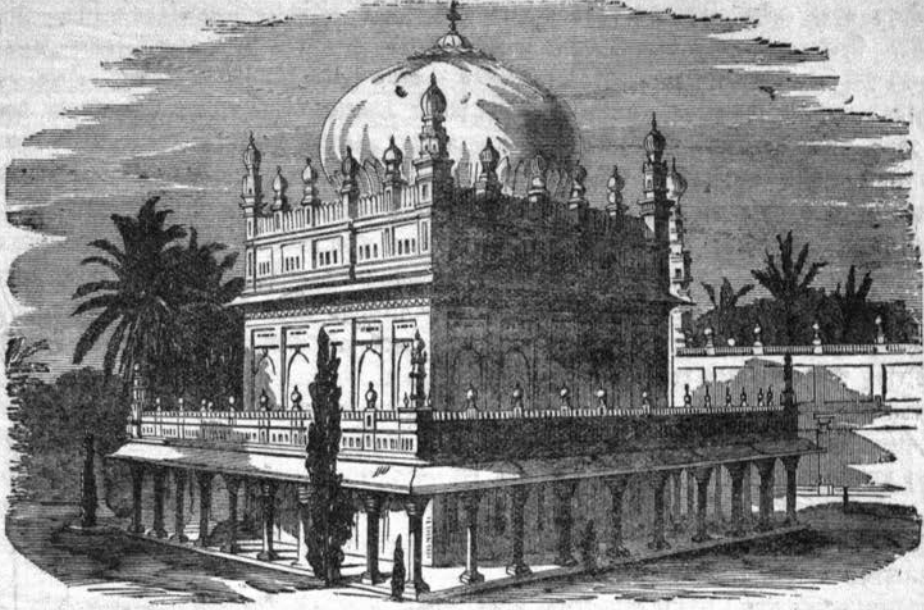
মহীশূর ও দক্ষিণ-পশ্চিম-উপকূল।

মহীশূর রাজ্য দেশীয় হিন্দু রাজার অধীন; মান্দ্রাজের পশ্চিমে, দাক্ষিণাত্যের সমভূমিতে স্থাপিত। আয়তনে এ রাজ্যটী সিংহলের সমান। হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের প্রাদুর্ভাবকালে এ রাজ্যের বিলক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছিল। পূর্ব্ব দিকে বাঙ্গালোর; এখানে ব্রিটিশ কমিশনর ও অনেক ব্রিটিশ সৈন্য থাকে। দক্ষিণে মহীশূর, এইখানে মহারাজার রাজধানী। শ্রীরঙ্গপত্তন কাবেরী নদীর দ্বীপ বিশেষ, এইখানে হায়দর আলির বংশীয়দিগের রাজধানী ছিল। ১৭৯৯ সালে ইংরাজেরা যখন নগরটী অবরোধ করেন, তৎকালে টিপু যুদ্ধে হত হয়েন।

কালীকুট মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির পশ্চিম উপকূলে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই নগরের পত্তন হয়। ইংরাজিতে এক প্রকার কাপড়কে কেলিকো কহে, সেই নামটী কালীকুট হইতে হইয়াছে। কথিত আছে যে, মালাবারের অধীশ্বর চিরুমন পিরুমল এই নগরের পত্তনকর্ত্তা। মক্কা যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তিনি এই নগরটী জামোরিণ নামক জনৈক সেনাপতিকে দান করেন। ইউরোপীয়েরা সর্ব্ব প্রথমে কালীকুট বন্দরে আইসে। কলম্বাসের দ্বারা আমেরিকা আবিষ্কৃত হইবার ছয় বৎসর পরে ভাস্কো দা গামা ১৪৯৮ সালে এই বন্দরে পঁহুছেন। ১৫১৩ সালে পর্ত্তুগীজেরা এই খানে এক কুঠী স্থাপন করে। ১৬১৬ সালে ইংরাজেরা প্রথমে এই খানে বাস করেন। কিন্তু ১৭৯২ সালের পূর্ব্বে তাঁহারা রাজার স্বত্ব প্রাপ্ত হয়েন না।

কচিন মালাবারের দক্ষিণে, অতি ক্ষুদ্র রাজ্য, জনৈক দেশীয় রাজার অধীন। চিরুমন পিরুমলের আমলে মালয় রাজ্য বিভাগ হওয়াতে কচিন রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। কচিনের রাজারা উক্ত চিরুমন পিরুমলের বংশধর। বহুকাল পূর্ব্বে কচিন পর্ত্তুগীজদিগের হস্তগত হয়, এবং ষোড়শ শতাব্দীতে উহারা কচিনে একটী দুর্গ স্থাপন করত, পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে বাণিজ্য এবং ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য চালায়। ১৬৬৩ সালে দিনেমারেরা এই স্থান দখল করে। ১৮০৯ সালে কচিন ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত হয়। কচিনের নিকটে ইর্ণাকুলম নামে একটী নগর আছে, এই খানে রাজার বাস, বা রাজধানী।

ত্রিবাঙ্কোর হিন্দুরাজ্য। ভারত প্রায়দ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিম অংশ এই রাজ্যভুক্ত। অনেকের মতে, এশিয়া খণ্ডে এমন সুন্দর দেশ দুর্লভ। ইহার পূর্ব্ব সীমানা ঘাট পর্ব্বত, পশ্চিম সীমানা আরব সাগর। এই সীমানার মধ্যে অপ্রশস্ত ও দীর্ঘাকার বন্ধুর এক খণ্ড ভূমি আছে; তাহাতে ধান্যক্ষেত্র, নারিকেল, তাল ইত্যাদির বাগান, মন্দির এবং গির্জা শোভা পায়। ত্রিবাঙ্কোর ও কচিন, এই দুই দেশেই সমুদ্রকূলে খোঁচ আছে। তাহার এক একটা বড় বড় হ্রদের মতন দেখিতে বড় সুন্দর। মুসলমানদের দ্বারা ত্রিবাঙ্কোর আক্রান্ত না হওয়াতে সে কেলে গোঁড়া হিন্দু ধর্ম্ম এদেশে প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষের আর কোন দেশে ব্রাহ্মণদিগের এত প্রাদুর্ভাব নাই। একটী অনুষ্ঠান কালে, প্রধান ব্রাহ্মণের পাল্কিবাহক স্বরূপ রাজাকে কিছুকালের জন্য কতক গুলি ক্রিয়া করিতে হয়। রাজা উক্ত ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালন করত পাদোদক পান করেন। রাজা জাতিতে শূদ্র কিন্তু একটী সুবর্ণ নির্ম্মিত গাভী বা পদ্ম ফুলের সহিত তুলিত হইয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েন। রাজা নিজে ওজনে যতটা, সোনার গোরুটীও ওজনে ততটা। উক্ত গাভী শেষে খণ্ড খণ্ড করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করা হয়। এই প্রকারে দ্বিজ হইলে পর মহারাজা আর আপনার আত্মীয়গণের সহিত একত্র ভোজন পান করিতে পারেন না। কিন্তু ব্রাহ্মণভোজন দর্শন ও ব্রাহ্মণের সাক্ষাতে ভোজন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েন।

লর্ড লাণ্ডস্ডৌন।

পুলায়ন নামে দাস জাতীয় লোকেরা ব্রাহ্মণ দেখিলে ৯৬ পদ; পার্শি, যাহারা তাল গাছের রস পাড়ে, তাহারা ৩৬ পদ দূরে থাকিবে। নায়ার প্রধান শূদ্র, সে ব্রাহ্মণের নিকটে যাইতে পায়, কিন্তু ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিতে পায় না। ক্রমে জাতিভেদ উঠিয়া যাইতেছে।

রাজধানীর নাম ত্রিবেন্দ্রম—এখানে একটী কলেজ আছে।

ব্রহ্মদেশ।

ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত নহে, কিন্তু এক্ষণে উক্ত দেশ ভারতগবর্ণমেন্টের অধীন, এই জন্য এ স্থলে উহার বিবরণ সংক্ষেপে লিখিত হইবে।

ব্রহ্মদেশ বঙ্গদেশ ও বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্ব দিকে, ক্ষেত্রপরিমাণ ১৪০০০০ হাজার বর্গ ক্রোশ। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সি একত্র করিলে যতটা হইবে, ব্রহ্মদেশ তদপেক্ষাও বড়। কিন্তু লোকসংখ্যা বড় কম,—৮০ লক্ষ মাত্র।

প্রধান নদী ঐরাবতী। দেশটী প্রধানতঃ পর্ব্বতময়; কেবল ঐরাবতীর ব-দ্বীপ সমভূমি। বৃষ্টিপাত বড় বেশি। প্রধান শস্য ধান্য। বনে অপর্য্যাপ্ত সেগুন বৃক্ষ আছে। এদেশের নীলকান্ত মণির খনি বিখ্যাত।

লোক। ব্রহ্ম দেশীয় লোককে বাঙ্গালিরা মগ বলে, ইহারা খর্ব্বকায়, কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট; মাথা ছোট, কপাল প্রশস্ত, নাক অনুচ্চ। ইহাদের রং কটা, মাথায় চুল অপর্য্যাপ্ত। কিন্তু দাড়ি গোঁপ নাই বলিলেই হয়।

ইহারা চীনে ও মালে জাতির মধ্যবর্ত্তী। ইহাদের ভাষা এক স্বরযুক্ত; কিন্তু কথার নীচে কথা যোগ করা যাইতে পারে। এই ভাষার অক্ষর বা বর্ণমালা আছে, তাই চীন ভাষা হইতে অনেক ভাল। ইহাদের বর্ত্তমান অক্ষর আসামী ও উড়িয়া অক্ষরের ন্যায় গোলাকার। স্ত্রীপুরুষ উভয়ে সাদা জাকেট গায়ে পরে। পুরুষেরা লম্বা কাপড় কোমরে জড়ায়, স্ত্রীলোকদের কাপড় তত লম্বা নহে। পান খাওয়া আর চুরুট টানা স্ত্রী পুরুষ উভয়ের অভ্যাস। ব্রহ্ম দেশীয় ঘর বাঁশের, চালে পাতার ছাউনি। ভূমি হইতে অনেকটা উচ্চ হওয়াতে বর্ষা কালে ইহাদের ঘরে জল প্রবেশ করিতে পায় না। রাজার আমলে রাজার হুকুম বিনা কেহ পাকা বাড়ী তৈয়ার করিতে পাইত না। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা বেশি পরিশ্রমী; ক্রয় বিক্রয়, বস্ত্র বয়ন ও সংসারের সমস্ত কার্য্যই স্ত্রীলোকে করে, এবং তদুপলক্ষে স্বাধীন ভাবে যেখানে আবশ্যক, গিয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই আমোদ আহ্লাদ বড় ভাল বাসে। মোরগের যুদ্ধ বড় প্রিয় আমোদ। আবার মহিষের লড়াই হইলে তাহা দেখিবার জন্য রাজ্যের লোক ভাঙ্গিয়া পড়ে।

প্রকৃত মগ ব্যতীত আরও নানা জাতীয় লোক এই দেশে বাস করে। পূর্ব্ব সীমানা দিয়া শান নামে এক জাতীয় লোকের নিতান্ত বাহুল্য দেখিতে পাই। দক্ষিণাঞ্চলেই কেবল কারেন জাতীয় লোকের বাস।

শিল্প। স্ত্রীলোকে কার্পাসের বস্ত্র বোনে। দেশীয় রেশমদ্বারা রেশমী কাপড় প্রস্তুত হয়, তাহাও স্ত্রীলোকে বোনে। কোন কোন স্থানে মাটির হাঁড়ি, ও সামান্য প্রকার ছুরি কাঁচি এবং সোনা রূপার গহনা প্রস্তুত হয়। গালা দিয়া মগেরা যে সকল পাত্র প্রস্তুত করে, তাহা অতি সুন্দর। রাজধানীর উত্তরে একটী সমগ্র পাহাড় শ্বেত প্রস্তরময়, তাই দিয়া লোকে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি প্রস্তুত করে। বড় বড় ঘণ্টা ঢালাই ও গিল্টি করিতে ইহারা বড় পটু।

ধর্ম্মসংক্রান্ত বাটী দুই প্রকার, পাগদা ও আখড়া। ফুঙ্গী বা পুরোহিতেরা আখড়ায় বাস করেন, পাগদায় বুদ্ধ দেবের মূর্ত্তি বা আর কোন স্মরণার্থ চিহ্ন থাকে।

আজি কালিকার বাটী সকল কাষ্ঠ নির্ম্মিত। রাজবাটী বা আখড়া, এ সকলে অতি আশ্চর্য্য কারুকার্য্য ও গিল্টি করা; ইহার দ্বারা অমার্জ্জিত রুচি প্রকাশ পায়। দেশের সর্ব্বত্রই পাগদা। কাঠের উপরে কারুকার্য্য করিতে মগেরা বিলক্ষণ পটু, ও নানা রূপে ইহারা মন্দির আদি গিল্টি করে। কথিত আছে, কোন একটী মন্দির গিল্টি করিতে চারি লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল।

ধর্ম্ম। বৌদ্ধ ধর্ম্ম এদেশে প্রচলিত। এই ধর্ম্মের স্থাপনকর্ত্তার নাম শাক্য মুনি, ইঁহার পিতা উত্তর ভারতবর্ষের কোন দেশের রাজা ছিলেন। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে শাক্যমুনির জন্ম হয়। কঠিন তপস্যা করত বুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম বুদ্ধ হয়। ইঁহার অনেক শিক্ষা অতি উত্তম, কিন্তু ইনি ঈশ্বর এবং আত্মার অস্তিত্ব মানিতেন না। যে গুরু পিতাকে অগ্রাহ্য করত ভ্রাতাকে দয়া করিতে শিক্ষা দেন, শাক্যমুনি তদ্রূপ ছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর কাল নিজ ধর্ম্ম মত প্রচার করত বুদ্ধদেব, তৈলাভাবে যেমন দীপনির্ব্বাণ হয়, তদ্রূপ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। নিম্নলিখিত অর্থব্যঞ্জক কথাগুলি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিকে আবৃত্তি করিতে হয়।

১। আমি বুদ্ধ দেবের আশ্রয় গ্রহণ করি।

২। আমি তাঁহার শিক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করি।

৩। আমি পৌরোহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করি।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসিরা পীত বসন পরে, মাথা কামায় এবং বিবাহ করিতে পায় না। ব্রহ্মদেশে অনেকে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করে; কিন্তু যখন ইচ্ছা, গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিতেও পারে।

দেশীয় শাসনপ্রণালী।

রাজা আপন প্রজার ধন প্রাণ, সর্ব্বস্বের কর্ত্তা ছিলেন। তিনি যাহাকে ইচ্ছা, যন্ত্রণা দিতে, কারাগারে রাখিতে, বা বধ করিতে পারিতেন। লোকে এক প্রকার তাঁহার পূজা করিত। রাজার সম্বন্ধে কোন কথা উপস্থিত

হইলে তৎপূর্ব্বে স্বর্ণময় কথাটি উচ্চারণ করিতে হইত। কেহ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইলে বলিতে হইত, আমি স্বর্ণময় চরণ দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। রাজা কাহার কথায় কর্ণপাত করিলে বলিতে হইত, আমার কথা স্বর্ণ কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। বাঙ্গালি স্ত্রীলোকেরা যেমন কোন কোন গুরু জনের নাম ধরিতে পারে না, মগেরা তেমনি রাজার নাম ধরিত না, রাজার উল্লেখ করিতে হইলে বলিত, ধন প্রাণের কর্ত্তা বা খড়্গস্বামী অমুক আজ্ঞা করিয়াছেন। ঘাতকদিগের মুখে গোল গোল দাগ ও সর্ব্ব শরীরে উল্কি থাকিত। তাহাদিগের মুখ দেখিলেই ভয়ে লোকের প্রাণ উড়িয়া যাইত।

বহু হস্তির স্বামী, এইটি রাজার বড় প্রিয় উপাধি ছিল। তোমরা অনেক সময়ে ইংরাজদের ন্যায় দেশী সাদা মানুষ দেখিয়াছ। তাহাদিগকে শ্বেত মনুষ্য বলে। চর্ম্মে এক প্রকার বর্ণের অভাব হেতু মানুষ সাদা হয়। এইরূপ সাদা হাতিও জন্মে, সেই হাতিকে শ্বেত হস্তি বলে। মগেদের বিশ্বাস এই যে শ্বেত হস্তি পর জন্মে বুদ্ধ হইবে, এই জন্য ইহারা সাদা হাতিকে বড় মান্য করে। রাজার পরেই সাদা হাতির জন্য উত্তম বিছানা ছিল, তাহা রেশমি কাপড়ে প্রস্তুত, সোনার পাত্রে করিয়া তাহাকে আহার দেওয়া হইত, এবং দেশের মূর্খ লোকে তাহার পূজা করিত।

ইংলণ্ডের সহিত প্রথম যুদ্ধ।

লোকের চাটুবাক্যে ভুলিয়া ব্রহ্মদেশের রাজা মনে করিতেন, আমার মতন প্রবলপ্রতাপ রাজা পৃথিবীতে আর নাই।

১৮২৩ সালে মগেরা কাছাড়, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে আসিয়া লুটপাট করে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবার জন্য রাজাকে বার বার অনুরোধ করেন।

কিন্তু তিনি কোন উত্তর না দেওয়াতে ১৮২৪ সালে ইংরাজেরা যুদ্ধ ঘোষণা করেন। রাজার নিশ্চয় বিশ্বাস ছিল, যুদ্ধে জয়লাভ করিবেন, এই জন্য বঙ্গদেশ দখল করিয়া বড় লাটকে বন্দি করত স্বুবর্ণ চরণে লইয়া যাইবার জন্য লক্ষ জোড়া সোনার হাতকড়ি সৈন্যগণের সঙ্গে পাঠাইয়া দেন। ঐরাবতী নদী দিয়া যুদ্ধের নৌকা ভাসিয়া চলিল, সৈন্যগণ নৌকায় নাচিতে লাগিল। রাজা সেনাপতিকে হুকুম করিলেন, আমার নৌকা বাহিবার জন্য ছয় জন সাদা বিদেশী লোক পাঠাইয়া দিও। এক জন মন্ত্রিরাজ্ঞী তাহাতে এই কথা যোগ করিলেন, আমার রাজকার্য্য চালাইবার জন্য চার জন সাদা লোক পাঠাইয়া দিও, কারণ শুনিয়াছি, তাহারা বিশ্বাসি লোক।

রাজধানী হইতে ২০ ক্রোশ দূরে ইংরাজেরা গিয়া ছাউনি করিলে, রাজার ঘুম ভাঙ্গিল। দেখিলেন, দেশ ত যায়। তখন সন্ধি হইল, আরাকান, মারগুয়ি ও তাবয়, এই তিনটি অঞ্চল ইংরাজদিগকে দিতে হইল।

দ্বিতীয় যুদ্ধ।

ব্রিটিশ প্রজাদিগের উপর মগেরা উপদ্রব করাতে ১৮৫২ সালে এই যুদ্ধ হয়। ইংরাজেরা ক্ষতিপূরণ চাহিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। কিন্তু রেঙ্গুনের মগ লাট তাহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, আমি তোমাদিগের মুখদর্শন করিতে চাহি না।

অনন্তর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অবশেষে, ইংরাজেরা পেগু অঞ্চল লাভ করিলেন। পেগু আরাকান এবং তিনাশেরিম ব্রিটিশ ব্রহ্মের প্রধান কমিশনারের অধীন হইল।

শেষ যুদ্ধ।

ভূতপূর্ব্ব রাজা থিবো ১৮৭৮ সালে সিংহাসন প্রাপ্ত হন। দেশীয় প্রথা অনুসারে, রাজবংশীয় যাঁহারা সিংহাসনের দাবী করিতে পারেন, রাজা তাঁহাদিগকে বধ করিতে আরম্ভ করেন। কএক জন পলাইয়া ভিন্ন দেশে যাইতে সক্ষম হয়েন। রাজার এক ভ্রাতা কএক বৎসর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী হইয়া কলিকাতায় বাস করেন, আর এক জনকে ফরাশীরা পণ্ডিচেরি নগরে প্রতিপালন করেন।

মান্দালয় নগরে তৎকালে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এক জন দূত থাকিতেন। থিবো স্বেচ্ছাচারী ও অতি নিষ্ঠুর রাজা ছিলেন। তিনি তিন দিবসের মধ্যে রাজপরিবারস্থ স্ত্রীলোক, পুরুষ ও বালক বালিকা সমেত সত্তর জনকে বধ করেন। রেঙ্গুনের শাসনকর্ত্তা প্রাচীন লোক ছিলেন, রাজা তাঁহার মুখে ও নাকে বারুদ ভরিয়া দিয়া আগুন দেওয়াতে বেচারার মাথা ফাটিয়া যায়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আপন দূতের দ্বারা আপত্তি উত্থাপন করেন; কিন্তু দূতের পরামর্শে কর্ণপাত না করাতে তিনি তথা হইতে চলিয়া আইসেন। তাহাতে রাজার অন্যায় কার্য্যের প্রতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অসন্তোষ প্রকাশ পায়।

থিবো অত্যন্ত অপব্যয়ী ছিলেন, প্রজার মঙ্গল চিন্তা করিতেন না, যাহাতে টাকা আদায় হয়, কেবল সেই চেষ্টা করিতেন। সরকারি স্ফূর্ত্তি খেলায় যে লাভ হইত, তাহা নিজে লইতেন। বোম্বাই ট্রেডিং কোম্পানীকে সেগুন কাষ্ঠ বিক্রয় করাতে অনেক টাকা লাভ হইত। পূর্ব্ব রাজার আমলে উক্ত কোম্পানীর উপর কোন অত্যাচার হইত না, বরং রাজা ও কোম্পানী উভয়ের বিলক্ষণ লাভ হইত। জমা টাকা খরচ হইয়া গেলে থিবো উক্ত কোম্পানীর নিকট হইতে ধার করিতে আরম্ভ করিলেন। সরকারি বন হইতে পরে যে কাষ্ঠ কাটা হইবে, এই টাকা তাহার দাদন স্বরূপ দেওয়া হইত। অবশেষে রাজা বাইস লক্ষ টাকা চাহিলেন, তাহাতে উক্ত কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তারা বলিলেন, যে টাকা দিয়াছি, তাহার দরুণ যথেষ্ট কাষ্ঠ না পাইলে আর দিতে পারি না। অনন্তর কোম্পানীর নামে প্রতারণা অপবাদ দিয়া কোম্পানীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া, নিজেই তাহাদিগকে দোষী করত তেইস লক্ষ টাকা দাবী করিলেন। ফরাশীর দূত কোন ফরাশি কোম্পানীর পক্ষে, মান্দালয় নগরে গিয়া সরকারি বন ইজারা লইবার প্রস্তাব করিবার পাঁচ দিন পরে রাজা উক্ত টাকার দাবী করেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বোম্বাই কোম্পানীর বিষয়ে সুবিচার করণার্থে রাজাকে অনুরোধ করিলেন। ইহাতে রাজা অতি অপমানসূচক উত্তর দান করিয়া বলিলেন যে, এবিষয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই, সুতরাং আপনার দাবী ছাড়িয়া দিলেন না।

কিন্তু ফরাশী জাতির সহিত সন্ধি স্থাপন করাতেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হয়েন।

থিবো ইংরাজ জাতিকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। ফরাশী জাতির সহিত মিত্রতা করিয়া ইংরাজদিগকে তাড়াইয়া দিবার ইচ্ছা তাঁহার অনেক দিন ছিল। উচ্চ ব্রহ্মে ফরাশীদিগের আধিপত্য স্থাপিত হইলে ভারতবর্ষের অনেক অনিষ্ট হইত। ব্রিটিশ এলাকা দিয়া না গেলে ফরাশীদিগের জাহাজ উচ্চ ব্রহ্মে পঁহুছিতে পারিত না। ফরাশিরা পররাজ্য হরণ করিতে বড় পটু; তাহারা চীন সাম্রাজ্যের বড় বড় কয়েকটী অঞ্চল অধিকার করিয়া বসিয়াছে, এক্ষণে শ্যাম দেশ আক্রমণ করিবার ইচ্ছা বিলক্ষণ দেখিতে পাই। পাছে উত্তর পশ্চিম দিক হইতে রুশেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, এজন্য বহু ব্যয়ে অনেক সৈন্য রাখিতে ও অনেক রেল রাস্তা প্রস্তুত করিতে হইতেছে; রুশের ভারত আক্রমণ সম্ভাবনা না থাকিলে এই প্রকার অর্থ ব্যয় আবশ্যক হইত না। কিন্তু যদি ফরাশিরা ব্রহ্মদেশ অধিকার করিত, তাহা হইলে পূর্ব্ব সীমানায় তাহাদের আক্রমণ নিবারণের জন্য আরও অনেক সৈন্য রাখা আবশ্যক হইত।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মরাজকে যুদ্ধের পূর্ব্বে যে শেষ পত্র পাঠান, তাহাতে লেখা ছিল যে, মান্দালয় নগরে এক জন বৃটিশ রেসিডেণ্ট থাকিবেন, এবং পররাষ্ট্র বিভাগের ভার বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকিবে। রাজা এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া ঘোষণা করিয়া দেন যে, আমি নিজে সৈন্যসামন্ত লইয়া গিয়া অসভ্য ইংরাজদিগের দেশ অধিকার করিব। এক জন সেনাপতি মান্দালয় হইতে যাত্রা কালে রাজার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলেন যে, আমি ১৫ দিনের মধ্যে জেনারেল প্রিণ্ডারগাষ্ট ও কর্ণেল প্লেডেনের মস্তক আনিয়া আপনার চরণতলে রাখিব। শেষে কি হইয়াছিল, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন।

যুদ্ধের কারণ।— ভারতবর্ষীয় প্রায় সকল সংবাদপত্রের সম্পাদকই তৎকালে বলিয়াছিলেন যে, কেবল বম্বে ট্রেডিং কোম্পানীর স্বার্থ রক্ষা ও ইংরাজ বাণিজ্যের বৃদ্ধিসাধন জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মরাজের সহিত যুদ্ধ করেন, ভারতবর্ষের উপকার জন্য নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতবর্ষের শান্তিরক্ষা ও করভার বৃদ্ধি না করাই উক্ত যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল। ইংরাজেরা যে দাবী করেন, তাহাতে চীন সম্রাটের অনুমোদন ছিল। চীনেরা ভুক্তভোগী। রুশ ও ফরাশী, ইহারা উভয়েই চীনদিগকে বিলক্ষণ জ্বালাতন করিয়াছে, এ জন্য চীনেরা ইংলণ্ডের সহিত বন্ধুতা রাখিতে চাহে।

ব্যয়।—ব্রহ্মরাজ্য অধিকার করিতে যে ব্যয় হইয়াছে, অনেকে মনে করেন, তাহা ভারতবর্ষকেই বহন করিতে হইয়াছে। দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের পরেও এই কথা উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখক টেলর সাহেব বলেন,

"ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে অনেকেই ইহাতে আপত্তি করেন। কেহ কেহ বলেন, ইহাতে বৃটিশ অধিকার অত্যন্ত বিস্তৃত হইল; ইহার রক্ষা করা দুষ্কর অথচ নিতান্ত অলাভকর, ইহাতে লাভ না হইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের স্থায়ী ব্যয়ভার আরও বৃদ্ধি হইল। লর্ড ডেলহৌসির কথা সত্য, উক্ত ভয় অমূলক প্রতিপন্ন হইয়াছে।"

বিগত দশ বৎসরে নিম্ন ব্রহ্মদেশে ব্যয় বাদে বার্ষিক প্রায় এক কোটি টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

পতিত ভূমি ক্রয় করিয়া আবাদ করিতে গেলে প্রথম প্রথম লাভ না হইয়া বরং ক্ষতি হয়। কিন্তু আবাদ করিতে পারিলে বিলক্ষণ লাভ দাঁড়ায়। আবাদ হইলে নিম্ন ব্রহ্মে যেমন লাভ হইয়াছে, উচ্চ ব্রহ্মেও তেমনি হইবে।

ইহাতে কালক্রমে ভারতবর্ষের অনেক মঙ্গল হইবে। রাজস্ব হইতে ব্যয় বাদে অনেক টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে লোকের বসতি এত ঘন যে গড়ে এক এক জনের প্রতি দেড় বিঘা করিয়া জমি পড়ে। দেড় বিঘা জমি চায করিলে এক বৎসর কাল এক জন লোকের ভরণ পোষণ চলে না। স্মুতরাং উক্ত প্রদেশের লোকেরা উচ্চ ব্রহ্মে গিয়া বাস করিলে স্মুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে।

নিম্ন ব্রহ্মের বিষয়ে লর্ড ডেলহৌসির যে আশা ছিল, এত কাল পরে তাহা সফল হইয়াছে। কালক্রমে উচ্চ ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধীয় লর্ড ডফারিণের আশা সফল হইবে। আপাততঃ ব্যয় বাদে কিছু কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। ১৮৯০ সালে এক কোটী সাত লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত ছিল।

নগর।

রেঙ্গুণ নিম্ন ব্রহ্মের রাজধানী, ঐরাবতী নদীর পূর্ব্ব শাখার তীরে স্থিত, সমুদ্র হইতে দশক্রোশ। নদী-তীরে পোস্তা আছে, এই পোস্তা ও পুরাতন গড়-খাইয়ের মধ্যস্থিত ভূমি প্রশস্ত ও সরল রাস্তা দ্বারা চতুষ্কোণ নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। উত্তর দিকে কাণ্টন্মেণ্ট, তাহার সীমানার মধ্যেই স্মুদাগুণ দাগোবা, পর্ব্বতটীর চারি দিকে গড়বন্দী। রেঙ্গুণ বিলক্ষণ বাণিজ্যের স্থান হইয়া উঠিয়াছে। চাউল, কাষ্ঠ, তুলা, গো-চর্ম্ম এবং মহিষের শৃঙ্গ ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি হয়। ১৮৮১ সালে লোকসংখ্যা ১৩৪,১৭৬ ছিল। মৌলমীন সালুইন নদীর মুখে। এখানে কাষ্ঠের বাণিজ্য যথেষ্ট হয়।

মান্দালয় ঐরাবতী নদীর নিকটে, পূর্ব্বে এইটী ব্রহ্মদেশের রাজধানী ছিল। ১৮৬০ সালে থিবোর পিতা নিকটবর্ত্তী অমরপুর নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। ঐরাবতী নদী হইতে এক ক্রোশ ব্যবধান একটী পর্ব্বতের গোড়ায় উক্ত নগর স্থাপিত। প্রকৃত নগরটী একটী চতুষ্কোণ ভূমিখণ্ড। তাহার এক এক দিকের দৈর্ঘ্য অর্দ্ধ ক্রোশের অধিক। রাজার বাটী ঠিক মধ্যস্থলে। এই বাটী সেগুন কাষ্ঠনির্ম্মিত, কোন কোন অংশ অতি চমৎকার কারুকার্য্য ও গিল্টি করা।

প্রাচীরের বাহিরেও অনেক লোকের বসতি। নগরবেষ্টিত প্রাচীরের ভিতরে ও বাহিরে যত বাটী আছে, তাহার অধিকাংশই বাঁশের এবং মাচার উপরে স্থাপিত। এখানে সেখানে দুই একটী ইষ্টক বা কাষ্ঠনির্ম্মিত বাটী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে গুলি প্রায়ই চীনেদের। এখানে রেশমি কাপড় অনেক প্রস্তুত হয়। লোক সংখ্যা ৭০০০০। রেঙ্গুণ হইতে মান্দালয় পর্য্যন্ত রেলপথ হইয়াছে। ঐরাবতীর সাগরসঙ্গম স্থান হইতে ভামো চারি শত ক্রোশ। নদীতে ষ্টীমার চলে।

ব্রহ্ম দেশের বিবরণ নামে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক হইয়াছে, মূল্য ৵০ আনা।

ভারতবর্ষের বিগত ও বর্ত্তমান অবস্থা।

বিগত কালের বিষয়ে ভ্রমাত্মক ধারণা।—ভারতবর্ষের কি কি বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিবার পূর্ব্বে এই বিষয়ে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত লোকে চিরকালই বলিয়া থাকে যে, সে কাল বড় স্মুখের কাল ছিল, বর্ত্তমান কাল বড় দুঃখের। খ্রীষ্টাব্দের ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে শলোমন রাজা এ বিষয়ে মনুষ্যজাতিকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, যথা,

"বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা পূর্ব্ব কাল কেন ভাল ছিল, ইহা কহিব না, কেননা ও বিষয় তোমার জিজ্ঞাসা করা প্রজ্ঞা হইতে উৎপন্ন হয় না।" অনেক ইংরাজে যেমন স্মুখের সে কালের কথা তুলিয়া আক্ষেপোক্তি করেন, ভারতবর্ষীয়েরাও আপনাদের দেশের অধঃপতন হইয়াছে বলিয়া তদ্রূপ দুঃখ করিয়া থাকেন। বিজ্ঞবর বর্কের কথা বিগত শতাব্দীতে ইংলণ্ডের প্রতি যেমন, বর্ত্তমান সময়ের ভারতবর্ষীয়দিগের মনোভাবের প্রতিও তেমনি খাটে।—

"এই অপয়া পক্ষীরা দুঃখের কান্না কাঁদিয়া আমাদের কান ঝালা পালা করিয়াছে, আবার যে সময়ে আমাদের সৌভাগ্যের অবধি ছিল না, সেই সময়েই অতি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছে।"

বিগত কালের বিষয়ে হিন্দুদিগের বিশেষ ভ্রমাত্মক সংস্কার থাকিবার কথা আছে। কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক বলেন, "ভারতবর্ষীয় ভাষাতে ইংরাজী History শব্দের প্রতিশব্দ নাই। অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বিগত ঘটনার প্রমাণসিদ্ধ বিবরণ লিখিয়া রাখার আবশ্যকতা হিন্দুদের মনে স্থান পায় নাই।" কাব্য ও বিষ্ণুপুরাণ হইতে ইহাঁরা বিগত বিষয়ের যাহা কিছু আভাস প্রাপ্ত হন।

"ইংলণ্ডের দ্বারা ভারতবর্ষের কি কি উপকার হইয়াছে, এক্ষণে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতে চাই।

১। যুদ্ধের পরিবর্ত্তে শান্তি।—লর্ড ডফারিন আজমির নগরে যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, বৃটিশ শাসন আরব্ধ হইবার পূর্ব্বে "এমন কোন বৎসর ছিল না, যে বৎসর সহস্র সহস্র সন্তানের রক্তে দ্বারা ভারতক্ষেত্র প্লাবিত না হইত।" আদিম নিবাসী দস্যুদিগের সহিত প্রাচীন আর্য্যগণের যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইত, ঋগ্বেদে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

"কখন কখনও আর্য্য সেনাপতিগণের পরস্পর যুদ্ধ হইত। ঈর্ষ্যা ও উচ্চাভিলাষ এই প্রকার গৃহবিচ্ছেদের কারণ। আর্য্যে অনার্য্যে সহস্র সহস্র বৎসর যুদ্ধ চলিয়াছে।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাহাকে ইতিহাস বলা যাইতে পারে, ভারতবর্ষের এমন কোন লিখিত বিবরণ নাই; নানা উপাখ্যানে বিশেষ বিশেষ যুদ্ধের অতিরঞ্জিত বিবরণ পাওয়া যায়। "পরশুরাম ত্রিসপ্ত বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ক্ষত্রিয়দের রক্তে বড় বড় ৫ টী হ্রদ পরিপূর্ণ করেন।" মহাভারতে কয়েকটী যুদ্ধের বিবরণ লিখিত আছে, সেই যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই প্রায় বিনাশ হয়।

দেশটী নানা ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সেই রাজারা পস্পরর সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতেন। এক বংশকে রাজ্যচ্যুত করিয়া অপর বংশ রাজ্য গ্রহণ করিতেন।

মহম্মদ গিজনির নাম সকলেই জ্ঞাত আছেন। তিনি কত বার আসিয়া ভারতবর্ষ ছার খার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরেও অনেকে আসিয়া দেশটী লুঠ পাট করিয়াছেন।

তৈমুর, নাদির সাহ ও আফগানেরা আসিয়া দেশের যে দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু বিদেশী ও স্বদেশী, এই উভয়ের যুদ্ধে ভারতবর্ষের যার পর নাই দুর্দ্দশা ঘটিত।

গুলবর্গের স্থলতান মহম্মদ সাহ বিজয়নগরের মহারাজার সহিত গায়ে পড়িয়া বিবাদ বাধাইয়া কোরাণ লইয়া দিব্য করেন যে, এক লক্ষ কাফের বধ না করিয়া আমার খড়্গ কোষের মধ্যে রাখিব না। যুদ্ধ উপস্থিত হইল, তাহাতে দেশের যে শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। মুসলমান ইতিহাস লেখক গর্ব্ব করিয়া বলেন, এই যুদ্ধে বিশ্বাসীদের (মুসলমানদের) দ্বারা পাঁচ লক্ষ কাফের (হিন্দু) হত হয়। কর্ণাট দেশ এক প্রকার লোকশূন্য হইয়া গিয়াছিল, পুনরায় লোকপূর্ণ হইতে বহু বৎসর লাগে।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের অত্যাচার পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। বৃটিশ শাসন স্থাপিত হইবার পর কোন বিদেশী সশস্ত্র হইয়া ভারতে প্রবেশ করিতে পারে নাই। দেশীয় রাজাদের পরস্পর যুদ্ধ নিবারিত হইয়াছে। ১৮৫৭ সালে সিপাহীবিদ্রোহ হইয়াছিল, নহিলে বরাবরই দেশে সুশান্তি বিরাজিত। দেশ রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টকে যে সৈন্যদল রাখিতে হইয়াছে, ১৮৮৩ সালে তাহার জন্য ১৭,৪৪,০০,০০০ খরচ পড়ে। প্রত্যেক প্রজাকে মাসে দেড় আনা করিয়া দিতে হইয়াছে।

২। চুরি ডাকাতি কমিয়াছে।—সকল দেশেই চোর ডাকাইত আছে, কিন্তু ভারতবর্ষে যুদ্ধ ও লেখা পড়া করা যেমন ক্ষত্রিয় ও কায়স্থদিগের জাতীয় ব্যবসা, তেমনি চুরি ও ডাকাতি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করা শতাধিক ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের পৈতৃক ও জাতীয় ব্যবসা ছিল। ইহারা যথারীতি দেবতার পূজা দিয়া পরস্ব অপহরণ করণার্থ দেশে দেশে বেড়াইয়া বেড়াইত। এবং আবশ্যক হইলে লোকের প্রাণ বধ করিতেও কাতর হইত না, অথচ মনে করিত, আমরা পৈতৃক ধর্ম্ম ও দেবতার আদেশ পালন করিতেছি। ইংরাজেরা যেমন বনে বাঘ শীকার করিয়া সহরে আসিয়া বন্ধুজনের কাছে সগর্ব্বে সেই বিষয়ে কথা কহেন, চুরি ডাকাতি করিয়া কৃতকার্য্য হইলে উক্ত জাতি-চোরেরাও পরস্পর তদ্বিষয়ে তদ্রূপ কথোপকথন করিত। এতদ্ব্যতীত অপর লোকেও অনেক চুরি ডাকাতি করিত।

সম্পত্তি রক্ষা করা অতি কঠিন কার্য্য বলিয়া লোকে সোণা রূপার গহনা ও টাকা মোহর মাটিতে পুতিয়া রাখিত। কিন্তু তাহাতেও রক্ষা হইত না, ডাকাইতেরা এমন যন্ত্রণা দিত যে কোথায় কি আছে, প্রাণের দায়ে গৃহস্থ বলিয়া দিত।

চুরি ডাকাতি ও খুন একেবারে নিবারণ করা কোনও গবর্ণমেণ্টেরই সাধ্য নহে, কিন্তু ইংলণ্ড অপেক্ষা ভারতবর্ষে উক্ত প্রকার অপরাধ এক্ষণে অনেক কম হইয়া থাকে। প্রতি বৎসরই কমিতেছে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলেও ১৮৬৭ সালে ভারতবর্ষের কারাগারসমূহে যত কয়েদী ছিল, ১৮৮২ সালে তাহা অপেক্ষা শত করা ২৫ জন কম ছিল। এত বড় প্রকাণ্ড দেশ, তাহাতে এই প্রকার সুশাসন,—ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে।

১৮৮৩ সালে পুলিশ পল্টনের সংখ্যা ১৩৭,৩৭৭ ছিল, ব্যয় ২৩,৭৮১,৪৩৩ টাকা। গড়ে প্রত্যেককে মাসিক দুই পাই করিয়া দিতে হইয়াছে। মাসে দুই পাই মাত্র দিয়া চোর ডাকাইতের ভয়রহিত হইয়া নির্ভাবনায় বাস করা কি ভাল নয়?

৩। কৃষিকার্য্য ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাটাখাল।—সর এডওয়ার্ড বক্ বলেন, "খাদ্য সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি হওয়াতে, বা খাজানা ও টাক্সের অত্যাচারে বা শাসন-প্রণালীর দোষে ভারতবর্ষের নানা অংশে কৃষকদিগের অন্নকষ্ট ও দরিদ্রতা হয় না, কিন্তু বৃষ্টিপাতের অস্থিরতা হেতু হইয়া থাকে। এই বৃষ্টিপাতই কৃষিকার্য্যসম্ভূত ধনের উৎপত্তি স্থান।" ভারতবর্ষে যে রূপ কাটা খাল হইয়াছে, পৃথিবীতে আর কোন দেশে সেরূপ হয় নাই।

যে স্থলে বৃষ্টিপাতের অস্থিরতা, সে স্থলে কাটা খালই এক মাত্র ভরসা। এক্ষণে ভারতবর্ষে ৪॥ হাজার ক্রোশ কাটা বড় বড় খাল ও দশ হাজার ক্রোশ ছোট ছোট খাল আছে। ইহার দ্বারা দেশের ধন প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকা পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে, ও আকালের বৎসর লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বাঁচিতেছে।

৪। রেলগাড়ি, জাহাজ ও সরকারী রাস্তা হওয়াতে গমনাগমন ও বাণিজ্যের বড় সুবিধা হইয়াছে।—দেশীয় রাজাদের আমলে লোকে পাল্কি করিয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া কিম্বা হাঁটিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইত, আর মহাজনেরা বলদের পৃষ্ঠে করিয়া বাণিজ্য দ্রব্য স্থানান্তর পাঠাইত। কোন প্রদেশে আকাল উপস্থিত হইলে, যে প্রদেশে যথেষ্ট শস্য হইত, তথা হইতে দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশে সহজে ও শীঘ্র ধান চাউল পাঠাইবার উপায় ছিল না; তাহাতে অনেক লোক অনাহারে মরিয়া যাইত। প্রায় ৫০,০০০ ক্রোশ সরকারী পথ ও ৯৫০০ ক্রোশ রেলপথ হইয়াছে, আবার প্রতি বৎসর হইতেছে। গঙ্গা, যমুনা ও সিন্ধু প্রভৃতি বড় বড় নদীতে পোল হইয়াছে। ১৮৯৫ সালে ১৪৫৭২৭০৯৭ জন লোক রেলপথে যাতায়াত করিয়াছে। ভারতবর্ষে সমস্ত উপকূলে জাহাজ চলিতেছে। বোম্বাই হইতে ষোল দিনে লণ্ডনে যাওয়া যায়।

৫। এই শতাব্দীর আরম্ভ হইতে সোণা ও রূপার দ্বারা চারি শত কোটি টাকার ধন বৃদ্ধি হইয়াছে।—অনেক বৎসর হইতে, সমস্ত পৃথিবীতে যত সোণা জন্মে, তাহার সিকি, ও যত রূপা জন্মে, তাহার ছয় আনা ভাগ ভারতবর্ষ আত্মসাৎ করিতেছে।

৬। স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে।—মেডিকেল কালেজ, হাঁসপাতাল ও ঔষধালয় স্থাপিত হইয়াছে; টীকা দেওয়াতে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব কমিয়াছে; জ্বরের প্রধান ঔষধ কুইনাইন, তাহার চাস হইতেছে। কতকগুলি প্রধান নগরে জলের কল হইয়াছে। মহারাণীর অনুমতি লইয়া লেডি ডফারিন এ দেশীয় পীড়িতা স্ত্রীলোকদিগের কষ্ট নিবারণের সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন।

৭। বিদ্যা শিক্ষা।—প্রজাদিগের বিদ্যা শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া সে কালে গবর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত না। বৃটিশ গবর্ণমেন্ট স্কুল ও কালেজ স্থাপন করিয়া শিক্ষাকার্য্যে উৎসাহ দান করিতেছেন। ১৮৮৮ সালে ছাত্র সংখ্যা ৩,২১৬,১৯৪ ছিল।

৮। শাসন কার্য্যের উন্নতি।—নবাবি আমলে রাজকর্ম্মচারীদিগের বেতন অতি সামান্য ছিল, তাহাও মাসে মাসে দেওয়া হইত না; সুতরাং তাঁহারা ঘুষ লইতেন ও প্রজার প্রতি অত্যাচার করিতেন। সে কাল আর নাই। এখন অধিক বেতনে সুশিক্ষিত রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছে, বেতন নিয়মিত সময়ে দেওয়া হয়, শাসনকার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম চলিতেছে। এখনও মধ্যে মধ্যে বিচার-বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে, এবং পুলিশের নামেও অত্যাচারের অভিযোগ হয়, কিন্তু মোটের মাথায় দেশের শাসনকার্য্য উত্তমরূপে চলিতেছে।

সে কালের হিন্দু ভারতবর্ষের এ কালের অবস্থা দেখিলে কি ভাবিবেন, হণ্টার সাহেব কল্পনা-সাহায্যে তাহার বিলক্ষণ চিত্র লিখিয়াছেন।—

"সে কালের কোন হিন্দু যদি জীবিত হইয়া পৃথিবীতে আসিতে পারিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া কি ভাবিতেন, ইহা আমি নির্জ্জনে বসিয়া অনেক বার চিন্তা করিতাম। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া তিনি অবাক হইতেন। তাঁহার সময়ে যে ভূমি জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, ও যাহাতে বন্য পশু বাস করিত, তাহাতে এক্ষণে সোণা ফলিতেছে; যে সকল বাদায় গেলে মানুষ জ্বর হইয়া মরিয়া যাইত, তাহাতে এখন সুন্দর সুন্দর নগর হইয়াছে; যে সকল পর্ব্বত প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিল, তাহা ভেদ করিয়া রাজপথ ও রেলরাস্তা হইয়াছে; যে সকল নদী থাকাতে এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে গমনাগমনের বাধা হইত, এবং অনেক প্রদেশ জলে ডুবিয়া যাইত, তাহাতে বাঁধ, পুল, ও খাল হইয়াছে। কিন্তু প্রজারা যে নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতেছে, ইহা দেখিয়াই তিনি যার পর নাই চমৎ-কৃত হইতেন। এক শত বৎসর পূর্ব্বে যে প্রদেশের লোক রাজা প্রজা সকলেই কোথাও যাইতে হইলে সশস্ত্র হইয়া বাহির হইত, এখন সেই সকল প্রদেশে তিনি একটী পুরাতন বন্দুক বা একখানি তরওয়ালও খুঁজিয়া পাইবেন না। তাঁহার আমলে যে সকল ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রজারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া অধঃপাতে যাইত, এক্ষণে তাহারা বন্ধু ভাবে বাণিজ্য করিতেছে, এবং রেলপথ, ডাকঘর, ও টেলিগ্রাফ দ্বারা পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। অনেক পরি-

বর্দ্ধন ও নূতন বিষয় তাঁহার চক্ষে পড়িবে। তিনি দেশের নানা স্থানে বিদেশী ধরণের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাটী দেখিয়া মনে মনে কহিবেন, এ গুলি আবার কি? হয় ত জিজ্ঞাসা করিবেন, কোন্ রাজা এত বড় বাড়ীতে সুখে বাস করেন? উত্তরে হয় ত শুনিবেন, এটা রাজার বিলাসভবন নহে, গরিব দুঃখী লোকের জন্য হাঁসপাতাল। আর একটা বাড়ী দেখিয়া হয় ত জিজ্ঞাসা করিবেন, এটী কোন্ দেবতার মন্দির? উত্তরে হয় ত শুনিবেন, এটী দেবতার মন্দির নহে, ছেলেদের জন্য স্কুল। উচ্চ দুর্গের পরিবর্ত্তে তিনি দেখিবেন, বিচারালয়; মুসলমান সেনাপতির পরিবর্ত্তে তিনি দেখিবেন, এক এক জন ইংরাজ মাজিষ্ট্রেট এক এক জিলার কর্ত্তা; সিপাহির পরিবর্ত্তে তিনি দেখিতে পাইবেন দেশময় পুলিশ পাহারাওয়ালা।”

অষ্ট্রিয়া দেশের রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত বেরণ হুপনার ভারত-ভ্রমণ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুন।

"অত্যন্ত বিশ্বস্ত সূত্রে এবং সাক্ষাৎসম্বন্ধে যে সকল সংবাদ পাইয়াছি, উপরে তাহার আলোচনা করিলাম। ইঙ্গ-বঙ্গ শাসনকার্য্যে যে সকল ত্রুটি দেখিয়াছি, তাহার একটীও গোপন করি নাই। যে সকল ত্রুটি ও দোষ, ছোট হউক, কি বড় হউক, আমার চক্ষে পড়িয়াছে, ও যাহার জন্য অন্যায় বা ন্যায় রূপে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে দোষী করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে যাহা বলিবার, তাহাও বলিতে ত্রুটি করি নাই। কিন্তু মনুষ্যজাতির স্বভাব-সুলভ ত্রুটি যদি না ধর, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের যে অবস্থা দেখিতেছ, তাহার তুলনা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। দেখিতে পাওয়া যায়, সাময়িক ও চিরস্থায়ী যুদ্ধের পরিবর্ত্তে দেশব্যাপি শান্তি; দামোদর ও নিষ্ঠুর অত্যাচারের পরিবর্ত্তে, করদ রাজারা যে হিসাবে কর আদায় করেন, তাহা অপেক্ষা লঘুকর ভার; স্বেচ্ছাচারী শাসনের পরিবর্ত্তে সূক্ষ্ম বিচার; উৎকোচগ্রাহী আদালতের পরিবর্ত্তে ন্যায়পরায়ণ বিচারক, যাহাদের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেশীয় লোকদিগের নীতিজ্ঞান ও ন্যায় অন্যায় বোধ উন্নত হইতেছে; পিণ্ডারি ও সশস্ত্র চোর ডাকাইতদিগের আর প্রাদুর্ভাব নাই; নগরে, পল্লীগ্রামে, এবং রাজপথে নির্ভাবনায় লোক চলাচল করিতেছে; সে কালের নিষ্ঠুর দেশাচার উঠিয়া গিয়াছে, লোকের ধর্ম্মকার্য্যে এবং পুরুষানুক্রমিক রীতি নীতিতে আর হস্তক্ষেপ হয় না; লোকের উন্নতির আর সীমা নাই; রেলপথ হওয়াতে খাদ্যসামগ্রী অতি শীঘ্র স্থানান্তর পাঠান যায় বলিয়া দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অনেক কমিয়াছে।

"এই প্রকার আশ্চর্য্য কার্য্য কি প্রকারে হইল? কএক জন রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতের জ্ঞান ও সাহস, বীরপুরুষদিগের দ্বারা চালিত অল্প সংখ্যক ইংরাজ ও বহুসংখ্যক দেশীয় সিপাহির বীরত্ব গুণে। যে জন কতক রাজকর্ম্মচারী ও মাজিষ্ট্রেট ভারতসাম্রাজ্য শাসন করেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্যপরায়ণতা, বুদ্ধি, সাহস, অধ্যবসায়, গুণপণা ও প্রলোভনরোধকারী ন্যায়পরায়ণতা গুণে।”

দরিদ্রতার আরোপিত ও প্রকৃত কারণ।

আমেরিকার সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক হুইট্‌নি সাহেব বলেন, "হিন্দু-অন্তঃকরণে ইতিহাস বোধশক্তি নাই বলিলেই হয়। সুতরাং বিগত কালের বিষয়ে তাহাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইতিহাসের পরিবর্ত্তে কতকগুলি গল্প দেখিতে পাওয়া যায়।”

জ্ঞানের অভাব ত নানা অনিষ্টের মূল, তদ্ব্যতীত জাতিভেদ রহিয়াছে, অর্দ্ধ শিক্ষিত হিন্দুর পক্ষে তাহা এক্ষণে দেশহিতৈষিতার স্থল অধিকার করিয়াছে। যাহাতে ইংরাজদিগের দোষ প্রকাশ পায়, এমন গুলিখুরী গল্প পাইলে দেশীয় সংবাদপত্র সম্পাদকগণের আর আনন্দের সীমা থাকে না। লাহোরের আর্য্যসমাজের মুখপত্র আর্য্য-পত্রিকা কলিকাতার কোন সংবাদ পত্র হইতে নিম্নলিখিত বিষয়টী উদ্ধৃত করেন।

ইংরাজেরা কেবল পশুহত্যা ও পশুমাংস আহার করে না, "জীবন্ত পশুর চামড়া ছাড়াইয়া লয়। ঘোড়া, মেষ, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি ইত্যাদি। বল কমাইবার জন্য কোন কোন পশুকে দিন কতক অনাহারে রাখে, পরে ক্ষুধায় ও পরিশ্রমে কাতর হইয়া পড়িলে পেরেক দিয়া তক্তার উপর গাঁথে, পরে চামড়া তুলিয়া লয়, পশু গুলি অতি কষ্টে প্রাণত্যাগ করে। কাজের যোগ্য কোন পশুই এই দুর্ভাগ্য এড়াইতে পারে না।” কলিকাতার কোন পত্রে লিখিত হইয়াছে যে, খ্রীষ্টীয় জগতের চক্ষের উপরে এই সকল কাণ্ড ঘটে।

২৪ শে অক্টোবর, ১৮৮৫।

ভারতবর্ষের দরিদ্রতার বিষয়ে দাদা ভাই নওরাজীর কথা অনেকের মতে অকাট্য। সর এম, ই, গ্রাণ্ডডফের প্রবন্ধের উত্তরে তিনি দুটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রত্যেক ব্যক্তির কত আয়, তাহাই তাঁহার প্রধান প্রমাণ। তাহা হইতে কএকটী বিষয় মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

দেশ।	প্রতি ব্যক্তির আয়।	দেশ।	প্রতি ব্যক্তির আয়।
ইংলণ্ড	৪১০ টাকা।	ইয়ুরোপ	১৮০ টাকা।
স্কটলণ্ড	৩২০ ,,	আমেরিকা	২৭০.২ ,,
আয়র্লণ্ড	১৬০ ,,	অষ্ট্রেলিয়া	৪৩০.৪ ,,
যুক্ত রাজ্য	৩৫০.২ ,,	ভারতবর্ষ	২০ ,,
ফরাশী দেশ	২৫০.৭ ,,		

দাদা ভাই নওরোজী বৃটিশ মহাসভার সভ্য হইয়া ভারতবর্ষের দরিদ্রতার বিষয়ে যে মত প্রকাশ করেন, কোন সংবাদ পত্রে তাহার এই রূপ আলোচনা হইয়াছে।

"অনন্তর তাঁহার মতে ভারতবর্ষের দরিদ্রতার কারণ কি, বক্তা তাহা বলিতে আরম্ভ করেন। অনেক নজীর উপস্থিত করিয়া দেখান যে, বিদেশী লোক রাজকার্য্যে নিযুক্ত করাতে দেশের অপর্য্যাপ্ত অর্থ চলিয়া যাইতেছে, একটী পয়সাও জমা হইতেছে না, দেশ ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, দায়ে পড়িয়া টাকা ধার করাতে আরও অবস্থা মন্দ হইতেছে।" ২৩ শে জানুয়ারি, ১৮৮৭।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক দরিদ্র, এ কথা স্বীকার্য্য; কিন্তু "ওয়েষ্ট মিনিষ্টার রিভিউ" যেমন বলেন, "একটী কথা অনেকে ভুলিয়া যান যে, ভারতবর্ষীয় সাধারণ লোকের অবস্থা যে কোনও সময়ে নিতান্ত মন্দ ছিল না, বরং ভাল ছিল, তাহার সটীক প্রমাণ নাই। ইহারা পুরুষানুক্রমিক দাস, স্বেচ্ছাচারী রাজা ও পদচ্যুত সৈন্যদিগের নিষ্ঠুর অত্যাচার হেতু প্রজারা প্রাণ হাতে করিয়া থাকিত।"

ভূতপূর্ব্ব সিন্ধিয়ার আমলে তাঁহার প্রজাদের যেরূপ অবস্থা ছিল, বোধ হয়, সেকালে ভারতবর্ষীয় প্রজাদের অবস্থা তাহা অপেক্ষা ভাল ছিল না।

তিনি ৫॥০ কোটি টাকা নগদ রাখিয়া যান, কিন্তু দেশে উত্তম রাস্তা ছিল না, রাজ-কর্ম্মচারীদিগের বেতন অতি কম ও করভারে প্রজারা নিতান্ত কাতর ছিল।

অর্থ (Currency), অর্থাৎ যাহা দ্বারা জিনিস ক্রয় করা যায়, তাহাই দেশের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের প্রমাণ। সে কালে ভারতবর্ষে টাকার পরিবর্ত্তে কড়ি প্রচলিত ছিল। চেম্বার সাহেবের সাইক্লোপিদিয়া নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে যে, "বঙ্গদেশে এক টাকাতে ৩২২০ কড়া কড়ি পাওয়া যাইত, সুতরাং এককড়া কড়ির মূল্য ইংরাজি এক ফার্দিংয়ের ছত্রিশ ভাগের এক ভাগ। কিন্তু এক সময়ে ভারতবর্ষে দুই লক্ষ টাকার কড়ি প্রতিবৎসর আমদানি হইত।" শ্রীরামপুরের ছোট মার্সমান সাহেব ৬০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন, "বাঙ্গালিরা কড়ি দিয়াই চিন্তা করে।" এখনও বঙ্গদেশে কড়ি আমদানি হয়, কিন্তু এত অল্প যে, কষ্টম হৌসের তালিকায় তাহা উঠে না। মান্দ্রাজে কড়ি প্রচলিত নাই। আসামে কড়ি চলে না, কিন্তু পাই পয়সা চলে। পশ্চিমে অতি পূর্ব্বকালে কড়ির ব্যবহার ছিল, এখন নাই। এক সময়ে বাঙ্গালীরা কাঞ্চনমূল্যের পরিবর্ত্তে পুরোহিতকে কড়ি দিতেন। এখনও বাংলাদেশে কড়ি প্রচলিত আছে, কিন্তু বড় কম।

যদি সমুদ্রকূলবর্ত্তী লোকেরা কড়ি ধরিয়া বাজারে বিক্রয় না করিত, বঙ্গদেশেও আর কড়ি চলিত না।

চীনদেশীয় লোকের অবস্থা অনেকাংশে ভারতবর্ষীয় লোকের সদৃশ। লেখক নিজে চীনদেশের অবস্থা স্বচক্ষে অনেক দেখিয়াছেন। তিনি কাণ্টন হইতে পিকিন ও ইয়াঙ্কি নদী উজাইয়া ৩৫০ ক্রোশ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছেন।
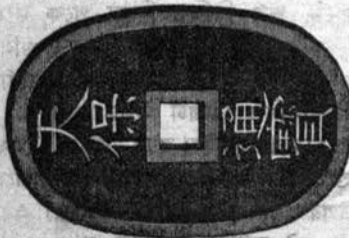
চীন দেশের মুদ্রা।

চীনদেশে একমাত্র পিত্তলের মুদ্রা আছে, তাহার মধ্যস্থলে ছিদ্র, তাহাতে সূতা দিয়া গাঁথিয়া রাখা যায়। সন্ধি সূত্রে যে যে বন্দরে বিদেশীরা বাণিজ্য ব্যবসায় চালাইবার অধিকার পাইয়াছে, তাহাকে সন্ধি-বন্দর বলে, সেই সকল বন্দরে মেক্সিকো দেশীয় রূপার ডলার নামক মুদ্রার ব্যবহার আছে। কিন্তু নদী উজাইয়া যতই দেশের অভ্যন্তরে যাইবে, ততই ডলারের বদলে দেশী পিত্তল-মুদ্রার প্রচলন দেখিতে পাইবে। একটা ডলার ভাঙ্গাইলে হাজার বার শত পিত্তল-মুদ্রা পাওয়া যায়,—এক মুটিয়ার বোঝা।

ভারতবর্ষের দরিদ্রতার আরোপিত কারণ।

দাদা ভাই নওরোজির মতে শাসনকার্য্যে "বিদেশী লোক নিয়োগই" দরিদ্রতার কারণ।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয় সম্বন্ধে লোকের নিতান্ত অজ্ঞতা দেখিতে পাওয়া যায়। অনুসন্ধান না করিয়া, যাহা মনে আইসে, অনেকে তাহাই বলিয়া থাকেন। "ওয়েষ্ট মিনিষ্টার" রিবিউ নামক পত্রে লিখিত

হইয়াছে যে, অনেকে ত্রিশ চল্লিশ কোটী টাকার কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের বিবেচনায় দশ কোটি টাকা যেন কথার কথা মাত্র।

সিবিল কর্ম্মচারীদিগের জন্য ব্যয়।—এ বিষয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের কথা বলিতে পারি না; কেবল মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির বিষয় বলিব। তাহাতেই অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে।

১৮৮৭ সালের এক খানি ইংরাজি পঞ্জিকাতে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল।—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে সর্ব্বসমেত ১৫৭ জন সিবিলিয়ান, (কেহ কেহ ছুটিতে আছেন), তন্মধ্যে ৭ জন দেশীয়। তাঁহাদের বেতন ও ভাতা মাসিক ২৩৩৭৫৪ টাকা। ১৮৮১ সালে লোক সংখ্যা ছিল ৩০,৮৩২১১৮১ জন। যে "অতিরিক্ত" কর ভারে মান্দ্রাজের প্রজারা "আর্ত্তনাদ করিতেছে," তাহা গড়ে এক এক জনের উপর মাসে ৵১৮ এক আনা সাত কড়া পড়ে। তবে ইহার উপর কর্ম্মচারীদিগের পেন্সনের ব্যয় আছে, তাহার বিশেষ বিবরণ পাই নাই, কিন্তু সে বড় বেশী নহে, বড় জোর ৫৩া কড়া মাসে। মনে কর, ১৫০ জন সিবিলিয়ানকে আগামী মাসে ছাড়াইয়া দেওয়া হইল, তাঁহারাও পাত তাড়ি গুটাইয়া দেশে গেলেন। তাঁহাদের স্থলে দেশী বি, এ, ও এম, এ-দিগকে ইংরাজদিগের তিন ভাগের এক ভাগ বেতনে নিযুক্ত করা গেল। তাহা হইলে যে টাকা বাঁচিবে, ভাগ করিলে বার্ষিক এক এক জনের প্রতি ৫১৩া পড়িবে। বাস্তবিক এ কেবল বহ্বাড়ম্বরে লঘু ক্রিয়া।

ইহা করিলে বেকার লোকদিগের সংখ্যা যে বড় কমিয়া যাইবে, তাহাও নহে। কেবল ১৫০ জন বি, এ, ও তাঁহাদের আত্মীয়গণের উপকার হইবে বটে; কিন্তু বাকি ১৩৫০ জন বি, এ, ও ১৭০০০ হাজার এল, এ, ও এণ্ট্রান্স ওয়ালাদের কি উপায়? কেবল বি, এ ওয়ালাদিগকে কাজ দেওয়া ত কথা নয়। ৩ কোটি লোকের মঙ্গল দেখিতে হইবে।

বেতন।—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে গড়ে এক এক জন সিবিলিয়ান মাসিক ১৫০০ টাকা পাইয়া থাকেন।

যাহারা জন খাটাইয়া রোজ ৶০ আনা করিয়া দেয়, তাহাদের পক্ষে মাসে দেড় হাজার টাকা বড় বেশী বোধ হইবে। ইংলণ্ডে মজুরেরা দুই শিলিং বা ১৲ এক টাকা, অর্থাৎ পাঁচ গুণ পায়। ইংরাজের পক্ষে দেড় হাজার, দেশী লোকের পক্ষে এ হিসাবে ৩০০ শত টাকা; ইহা তাহার বিবেচনায় কোন মতে অত্যধিক নহে।

অনেক রাজনীতিজ্ঞই সামান্য বিষয়ে ব্যয়কুণ্ঠ, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে বেশি ব্যয় করিলে শেষে অপব্যয় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

মনে কর, বাঙ্গালীরা মিলিয়া কলিকাতায় জাহাজ তৈয়ার করিবার জন্য এক কারখানা খুলিলেন, এবং ইংলণ্ডের কোন প্রধান কারখানা হইতে ৬০০ শত টাকা বেতনে এক জন ম্যানেজার আনাইলেন। এখন এক জন অংশীদার বলিলেন, "কেন, বিদেশীকে এত টাকা দিয়া রাখিবার প্রয়োজন কি?—লাভ ত ইহারই পেটে যায়। আমার ভাই ৩০০৲ শত টাকায় সব কাজ করিতে পারেন।" আর এক জন বলিলেন, "কেন, আমার ছেলে ২০০৲ টাকা পেলে খুশি হইয়া কাজ করিবে।" এখন কাহাকে রাখিলে বেশি লাভ হইবে, বল দেখি?

আর একটী দৃষ্টান্ত বলি। অনেকে মনে করেন, বর্দ্ধমানের মহারাজার আয় মাসে অনুমান সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। অতি সামান্য বেতনে ম্যানেজার রাখা কি তাঁহার উচিত? কোন কোন জিলার কালেক্টরকে ইহা অপেক্ষা বেশি টাকা আদায় করিতে হয়। আবার যাকে তাকে জজের পদে নিযুক্ত করিলে চলে না। লোকটী যোগ্য ও সাধুচরিত হওয়া চাই। আদালতের ভাল ভাল উকিলের মাসিক যে আয়, জজের বেতন তত হওয়া উচিত।

যোগ্য লোক পাইবার জন্যই ভারতবর্ষীয় সিবিলিয়ানদের মোটা বেতন ধার্য্য করা হয়। বর্ত্তমান বেতনের লোভেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইংরাজ এদেশে আইসেন না। এদেশের লাট ও বড় লাটের যে বেতন, অনেক ইংরাজ বণিকের আয় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক।

সৈনিক ব্যয়।—এই ব্যয় এক এক জন প্রজার প্রতি মাসিক ৴১০ পয়সা করিয়া পড়ে। ইউরোপীয় সৈন্যের জন্য অনেক ব্যয় হয়। বিদ্রোহিতার পূর্ব্বে বর্ত্তমান ইউরোপীয় সৈন্যের অর্দ্ধেক মাত্র ছিল। কতকগুলি সিপাহির বিশ্বাসঘাতকতা হেতু ইউরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। উক্ত সিপাহিরা প্রাতঃকালে আপনাদের বিশ্বস্ততার গৌরব করিয়া বৈকাল বেলা যখন তাহাদের সেনাপতিরা ভোজনে বসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগকে গুলি করিয়া বধ করে।

এ দেশে ইউরোপীয় সৈন্য না থাকিলে রুশেরা আসিয়া পড়িবে, কিম্বা হিন্দু মুসলমানে কাটাকাটি করিয়া মারা যাইবে।

জন প্রতি করভার।—"নব্য ভারত" নামক পুস্তকের লেখক এইচ, জে, এস, কটন সাহেবের ভ্রাতা এ, এস, কটন সাহেব অতি যত্ন পূর্ব্বক ১৮৮২-১৮৮৩ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের অবস্থা ও করভারের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মন্তব্য এই।—

১৮৮২-১৮৮৩ সালে ভারতবর্ষের মোট আয় ৬৯,২৯,৩২,৪১০ টাকা, ইহা দ্বারা প্রকৃত করভার কত, তাহা জানা যায় না।

"মিউনিসিপাল টেক্স ছাড়া উপরোক্ত অঙ্কে সকল প্রকার টেক্স ধরা আছে।" গড়ে এক এক জনের প্রতি বার্ষিক দুই টাকা, বা মাসিক দুই আনা আট পাই করিয়া পড়ে। যদি এ দেশের চাসা মোকদ্দমা না করে ও মাদক দ্রব্য না খায়, তাহা হইলে লবণের মাশুল বার্ষিক পাঁচ আনা দিতে কষ্ট বোধ করিবে না। "বাস্তবিক চাসা দরিদ্র, কিন্তু রাজা তাহার স্কন্ধে যে করভার চাপাইয়াছেন, তাহাতে তাহার দরিদ্রতার বৃদ্ধি হয় না।"

ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের হিসাবে যে টাকা খরচ হয়, অনেকে সেই বিষয়ে বিশেষ আপত্তি করিয়াছেন, রেলওয়ে ও কাটা খালের আয় ১২,২২,৪১,০০০; পোষ্টআফিস ও টেলিগ্রাফের আয় ১,৭০,৮৯,৯৪০। এই দুটিকে কোন প্রকার করের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে না। অহিফেণের আয় ৯,৪৯,৯৫,৯৪০ টাকা; এই টাকা প্রায় সমস্তই চীনদেশীয় লোকেরা দেয়। দেশীয় রাজারা সামরিক ব্যয়ের জন্য বার্ষিক ৬৮,৯৯,৪৫০ টাকা দিয়া থাকেন। কটন সাহেব জন প্রতি কত করভার পড়ে, তাহা এই রূপে দেখাইয়াছেন।

	মোট।	জন প্রতি।		
			আনা	পাই
লবণ ..	৬১২৩৯৮৪০		৪	১১
ষ্টাম্প	৩৩৪৩০৪৮০		২	৮
মাদক	৩৫৬৯৭৭৯০		২	১০
স্থানিয়	২৬৬৬৪৩৭০		২	১
পরমিট	১২৪৩৯২৭		১	০
নির্দ্ধারিত টেক্স ..	৪৯৬৮৩৬০		০	৭
রেজিষ্টরি	২৮৪১৪৩০		০	৩
ভূমির কর	২১৭৮৪৫৭৬০	১	১	৬
	৩৫৫১২৫৩১০	১	১৫	১০

পৃথিবীতে এমন সভ্যদেশ কোথাও নাই, যে দেশে রাজকরের গড়পড়তা ভারতবর্ষ অপেক্ষা কম। এক জন বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত কি বলেন, শুন;—

"ভারতবর্ষের শাসন কার্য্যে ব্যয়াধিক্য নাই—অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায়, ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রজাকে গড়ে দেশের শাসনকার্য্যের ব্যয় বার্ষিক যত দিতে হয়, ফরাশী দেশের প্রজাকে তাহার ২৪ গুণ, ইতালি দেশের প্রজাকে ১৩ গুণ, ইংলণ্ডের প্রজাকে তাহার ১২ গুণ, এবং রুশের প্রজাকে তাহার ৬ গুণ বেশি দিতে হয়।

অনেকে তলাইয়া না বুঝিয়াই বলিয়া থাকেন যে, "রাজকর স্বরূপ ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে প্রতি বৎসর তিরিশ কোটি টাকা প্রেরিত হইয়া থাকে। অথচ তাহার পরিবর্ত্তে একটী কানা কড়িও পাওয়া যায় না।" এ কথা নিতান্ত মিথ্যা। ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে রাজকর স্বরূপ একটী পয়সাও যায় না। ভারতবর্ষে টাকা ধার করিতে গেলে অনেক স্থদ লাগে, ইংলণ্ডে অল্প স্থদে পাওয়া যায়; এই জন্য গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের জন্য ইংলণ্ডে টাকা ধার করেন। কিন্তু এদেশে যাঁহাদের কোম্পানির কাগজ আছে, তাঁহারা যেমন স্থদ পান, ইংলণ্ডের কোম্পানির কাগজওয়ালারাও তেমনি স্থদ পাইয়া থাকে। সেই স্থদের টাকা ভারতবর্ষ হইতে লণ্ডনে পাঠাইতে হয়। আর ইংলণ্ডের অনেক লোক এদেশে কাজ করিয়া পেন্সন লইয়া দেশে গিয়াছে, তাহাদের পেন্সনের টাকা, আর ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের কাজের জন্য একটা প্রকাণ্ড আফিস রহিয়াছে, সেই আফিসের কর্ম্মচারীদিগের বেতনের টাকাও পাঠাইতে হয়।

ভারতবর্ষের হিসাবে ইংলণ্ডে অনেক টাকা খরচ হইয়া থাকে, অনেকে এ বিষয়ে আপত্তি করিয়া থাকেন। আচ্ছা, এক বৎসরের খরচের টাকাটা দেখাইয়া তর্ক করা যাউক। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে ১৪১০০৯৮২০ টাকা ভারতবর্ষের খাতায় লণ্ডনে খরচ হইয়াছিল। লণ্ডনে টাকা ধার করিয়া এ দেশে রেল-পথ, ও খাল খনন ইত্যাদি হইতেছে, তাহার স্থদের দরুণ ৭৪৪০১৬১০ টাকা, (অর্দ্ধেকের বেশি) দিতে হইয়াছিল। ভারতবর্ষের লোকেরা যদি টাকা মাটীতে পুতিয়া না রাখিয়া, ও গহনা না গড়াইয়া ধার দিত, তাহা হইলে লণ্ডনে টাকা ধার করিয়া প্রতি বৎসর সাত আট কোটি টাকা স্থদ যোগাইতে হইত না। দেশের টাকা দেশেই থাকিত। উক্ত বৎসর এদেশে

শতকরা বার্ষিক ৪ টাকা ও ৪।০ টাকা স্থদ দিতে হইয়াছে, কিন্তু লণ্ডনে ৩।০ টাকা স্থদ লাগে। যথেষ্ট গোরা সৈন্য না রাখিলে দেশে সিপাহি বিদ্রোহিতা উপস্থিত হইতে পারে, আবার রুশও আসিয়া পড়িতে পারে, এই জন্য গোরা রাখার নিতান্ত প্রয়োজন। স্থতরাং তাহাদের খরচ যোগাইতে হয়।

মনে কর, এদেশে যত ইংরাজ আছে, সকলেই তল্পি তাগাদা লইয়া যদি দেশে চলিয়া যায়, তাহা হইলে করভার কত কমে?—মাসে গড়ে প্রতি জনে এক আনা পয়সা। ভাল কথা; কিন্তু দেশের কি হইবে?—হিন্দু মুসলমানে, শিখে হিন্দুস্থানীতে, গুরুখাতে রাজপুতে ভয়ানক লড়াই বাধিয়া যাইবে, দেশে অরাজকত্ব উপস্থিত হইবে। সেই স্থযোগে কাবুল দিয়া, সিন্ধু পার হইয়া রুশ আসিয়া দেখা দিবে।

ভারতবর্ষে শ্রমজীবী-লোকের প্রত্যেক জনের বার্ষিক গড় আয় ২০ টাকা; কিন্তু ইংলণ্ডের ৫৫০ টাকা, ইউরোপের ১৮০ টাকা। দাদা ভাই নওরাজী এই শেষোক্ত উচ্চ আয়ের সহিত ভারতবর্ষীয় শ্রমজীবির আয়ের তুলনা করেন, এবং তাহাই কুশাসন ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পেটুকতার প্রমাণ রূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ফলে কিন্তু ইহাতে তাঁহার অজ্ঞানতাই প্রকাশ পাইতেছে। তিনি যদি তরল্‌ড রজার কৃত (The Six Centuries of Work and Wages, by Thorold Rogers,) পুস্তক পড়িতেন, তাহা হইলে এ কথা বলিতে পারিতেন না।

ফল কথা এই, এক্ষণে ভারতবর্ষে শ্রমজীবির বেতনের যে হার, পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডেও সেই হার ছিল, তখনও আমেরিকার খনি হইতে রাশি রাশি সোনা রূপা উত্থিত হইয়া শ্রমজীবির বেতনের টাকার হার বাড়ে নাই। আমেরিকার রূপাতেই ত ইংলণ্ডে বেতনের টাকার হার বাড়িয়া গিয়াছে। পটোসি পর্ব্বত দশ হাজার হাত উচ্চ, এটা প্রায় রূপারই পাহাড় ছিল।

রজার বলেন, "পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে সচরাচর, ও বার মাসই রাজমিস্ত্রী ইত্যাদি কারিকরের বেতন রোজ ।০ আনা ছিল। যাহারা ক্ষেতে জন খাটিত, তাহাদের রোজ ৶১০ আনা ছিল। ছুতারেরা ।০ আনা পাইত। (৩২৭ পৃষ্ঠা।) সচরাচর জন খাটাইলে তাহাদিগকে খোরাকি দিতে হইত। খোরাকি খরচ প্রতি সপ্তাহে ।০ আনা, ৵০ আনা পড়িত। (পৃ ৩২৮।) ১৫৬২ সালে শ্রমের মূল্য গড়ে ।৵৫ আনা রোজ ছিল (পৃ ৩৫৪)। ১৬৬৫ খ্রীঃ অব্দে রাজমিস্ত্রী ইত্যাদির বেতন ॥৶১০ আনা রোজ; সাধারণ মজুরের রোজ ॥১০ আনা (পৃ ৩৯২) ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজমিস্ত্রী ইত্যাদির রোজ ৮০ আনা হইতে ১ টাকা ছিল; চাসারা ॥৶০ আনা পাইত। উনবিংশ শতাব্দীতে রাজমিস্ত্রীর রোজ ১॥০ টাকা হইতে ৩ টাকা, চাসার রোজ ১ টাকা হইয়াছে। এক্ষণে ছয় গুণ বাড়িয়াছে। খাদ্য সামগ্রী, কাপড়, জমির খাজানা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ।০ কি ।৵০ আনায় এক একজন লোকের সপ্তাহের খোরাক চলিত। এক্ষণে আট গণ্ডা পয়সার কমে এক দিনের খোরাকি চলে না।

ইংরাজেরা জাতি মানে না, তাই দূরদেশে গিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা ধনবান হইতেছে; কিন্তু জাতিভেদই হিন্দুদিগের সর্ব্বনাশের মূল। বিদেশে গেলে, জাহাজে কালাপানি পার হইলেই জাতি গেল। এই কারণে হিন্দুরা ইংরাজ-দিগের ন্যায় ধনবান হইতে পারে না। আর এই কারণেই আমেরিকা খণ্ড আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডের জনসমাজের যে অবস্থা ছিল, এক্ষণে ভারতবর্ষীয় লোকেরও সেই অবস্থা। বিদেশী লোক চীন দেশের রাজকার্য্যে নিযুক্ত হয় না, স্থতরাং চীন দেশের টাকা বিদেশে যায় না, তথাপি চীন দেশের লোকের গড় আয় ভারতবর্ষীয় লোকের সমান। চীন দেশের পদাতি সৈন্যগণের বেতন মাসিক আট টাকা, তাও আবার মাসে মাসে পায় না। মান্দ্রাজের সিপাহিদের বেতন মাসিক সাত কি আট টাকা; তবে যখন চাউল মহার্ঘ হয়, তখন কিছু ধরিয়া দেওয়া হয়।

ভারতবর্ষেও জীবিকার নির্ব্বাহার্থ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ক্রমে ক্রমে চড়িতেছে। জিনিষপত্রের মূল্য বাড়িতেছে বলিয়া লোকে কতই না চীৎকার করিয়া থাকে; কিন্তু ভাবিয়া দেখ, জিনিষ পত্র মহার্ঘ্য হইলেই টাকা সস্তা হয়; টাকা স্থলভ হইলে লোকের অবস্থা সচ্ছল হইয়া থাকে। টাকার মূল্য যত বাড়িবে, জিনিষ পত্রের মূল্য তত কমিয়া যাইবে, এবং পরিশ্রমের মূল্যও তত হ্রাস পাইবে। যখন বঙ্গদেশে টাকায় দেড় মণ দুই মণ চাউল বিক্রয় হইত, তখন মজুরের রোজ ⁄০ আনা ছিল; এখন চাউলের মণ ২॥০ টাকা, ৩ টাকা, মজুরের রোজ ৮৵০ আনা, ।৶০ আনা। বাজারে অনেক মাচের আমদানি হইলে যেমন মাচ সস্তা হয়, খুব বেশি ধান জন্মিলে যেমন চাউল সস্তা হয়, এক্ষণে তেমনি টাকার বাহুল্য হওয়াতে জিনিষ পত্র মহার্ঘ, ও টাকার ক্রয় করণ ক্ষমতা কম হইয়াছে।

দারিদ্র্য নিবারণের উপায় কল্পনা।

কলিকাতায় যে "জাতীয় মহাসমিতির" অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে স্থিরীকৃত হয় যে, প্রজাদিগের প্রতিনিধি দ্বারা দেশের শাসন কার্য্যের সম্পাদন হইলেই প্রজারা দারিদ্র্য কষ্ট হইতে রক্ষা পাইবে।

এ দেশে একটী প্রবাদ আছে, "যার হাতে খাই নাই, সে বড় রান্ধুনী, যাকে দেখি নাই, সে বড় স্বন্দরী।" বহু কালের ভুক্তভোগিতা দ্বারা ইউরোপের লোকেরা বুঝিয়া আশা সংযম করিতে শিখিয়াছেন।

এ বিষয়ে "আত্ম সাহায্য" (Self-Help) নামক গ্রন্থের লেখক কি বলেন, শুন; "সকল কালেই মানুষে সহজেই বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে যে, নিজ নিজ ব্যবহার গুণে নহে, কিন্তু সভাসংস্থিতির দ্বারা সুখসৌভাগ্যের বৃদ্ধি হয়।" এটী বড় ভ্রম।

সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন ব্যবহারের সংশোধন না করিয়াই সমাজের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, ইহা বড়ই মূর্খতা; এ বিষয়ে হার্বার্ট স্পেন্সর কি বলেন, শুন;

"যাহারা কল তৈয়ার করে, তাহাদের অনেকে, কলের ভিন্ন ভিন্ন ভাগ কৌশলে সংযুক্ত করিয়া, গোড়ার দিকে যতটা চাপ দেয়, ডগার দিকে তাহা অপেক্ষা অধিক তেজ উৎপন্ন হইবার আশা করে। অনেক রাজনীতি কলের কামারেও তাই আশা করিয়া থাকে; রাজনীতি বিধিরূপ কল স্বকৌশলে চালাইয়া অবোধ লোক হইতে স্ববুদ্ধি-সংগত ফলের এবং নীচ লোক হইতে উচ্চ লোকসঙ্গত ব্যবহারের আশা করে।"

আজি ৫০০ শত বৎসর কাল ইংলণ্ডের শাসন কার্য্য প্রজাগণের প্রতিনিধিদিগের দ্বারা চলিয়া আসিতেছে, তথাপি, দেখ, লণ্ডন সহরে কত দরিদ্র লোক রহিয়াছে। লণ্ডন সহরে ধনবানও যেমন চূড়ান্ত, গরিবও তেমনি চূড়ান্ত। লণ্ডনের বেকার ও নিরুপায় লোকদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কি করিতে হইবে, তাহাই এক্ষণে ইংলণ্ডের বিজ্ঞ লোকদিগের চিন্তার বিষয়। ষ্টেড সাহেব লণ্ডনের মহাসভার বিষয়ে বলিয়াছেন যে, "মহা সভার বাটীর জানালা দিয়া গলা বাড়াইলেই আমাদিগের ব্যবস্থাপক বা আইন কর্ত্তারা দেখিতে পাইবেন যে, কত শত কদর্য্য বাসাবাটীতে, কত শত আহারাভাবে ক্লিষ্ট ও ক্ষুধিত লোক রহিয়াছে। ইহারা যে ভয়ানক কষ্টে জীবন ধারণ করিয়া আছে, বঙ্গ দেশের কোন গ্রামে, কোন লোকের তেমন কষ্ট হয় নাই।" ফলে বঙ্গ দেশের প্রজার ন্যায় সুখী প্রজা পৃথিবীতে খুব কম আছে। ভারতবর্ষ অপেক্ষা আয়র্লণ্ড ইংলণ্ডের খুব নিকটে, কিন্তু আয়র্লণ্ডের কৃষক অপেক্ষা বঙ্গদেশের কৃষক অধিক সুখী। নিজের একখানি কুড়ে ঘর নাই, এমন লোক, বোধ হয় বঙ্গদেশে নাই, কিন্তু ইংলণ্ডের অনেক দরিদ্রের মাথাটী গুজিবার স্থান নাই।

স্বীকার করি, কোন কোন ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী এদেশে প্রজা প্রতিনিধি শাসন প্রণালী প্রচলনের বিপক্ষ; কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট চিরকালই তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিয়া আসিতেছেন। স্যার রিচার্ড টেম্পলকে এদেশের লোকে, বোধ হয়, ভুলিয়া যান নাই; এবিষয়ে তিনি কি বলেন, শুন,—

"চিন্তাশীল ইংরাজেরা বিলক্ষণ জানেন যে, কালে ভারতবর্ষে প্রজাপ্রতিনিধি শাসন প্রণালীর প্রচলন উদ্দেশ্যেই গবর্ণমেণ্ট অনেক কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।"

আমাদের মতে প্রজাপ্রতিনিধি শাসন প্রণালী সহসা প্রচলিত না করিয়া ক্রমশঃ রহিয়া রহিয়া প্রচলিত করা বিহিত। এই প্রকার শাসনপ্রণালী রূপ বৃক্ষে স্বভাবতঃ যে ফল ফলিয়া থাকে, তদপেক্ষা অধিক ফলের আশা করিলে অবশেষে নিরাশ হইতে হইবে। মনে রাখিও যে প্রজাপ্রতিনিধি শাসনপ্রণালী হরিতকী ফল, বা হলওয়ে সাহেবের বটিকা নহে যে, তাহাতে সকল রোগেরই আরোগ্য হইবে।

দারিদ্র্য নিবারণের প্রকৃত উপায়।

বহুদর্শী রাজনীতিজ্ঞ যে সকল লোক শাসন কার্য্য চালাইয়াছেন, তাঁহাদের মতের সহিত অবহুদর্শী বক্তাদের মতের তুলনা করিয়া দেখিলে শাসন কার্য্য বিষয়ে আমাদিগের অনেক জ্ঞান জন্মিতে পারে। রাজা মাধব রাও পরে পরে ছুটী প্রধান হিন্দু রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি কি বলিয়া গিয়াছেন, শুন,—

"যে ব্যক্তি যত দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া পর্য্যবেক্ষণ ও চিন্তা করে, ততই সে দেখিতে পায় যে, ধরাতলে এমন কোন জনসমাজ নাই, যাহা হিন্দুদের অপেক্ষা রাজনীতিক দোষ প্রযুক্ত কম কষ্ট, এবং স্বকৃত, স্বগৃহীত, স্বসৃষ্ট, সুতরাং নিবারণযোগ্য দোষপ্রযুক্ত অধিক কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে।"

হণ্টার সাহেব ভারতবর্ষের অবস্থা যেমন জ্ঞাত আছেন, এমন লোক আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি কি বলেন, শুন।—

"ভারতবর্ষীয় লোকের দরিদ্রতার স্থায়ী প্রতিবিধানোপায় ভারতবর্ষীয়দিগের হাতে।"

গবর্ণমেণ্টের কার্য্য।

খ্রীষ্টাব্দের বর্ত্তমান শতাব্দীর আরম্ভ হইতে আজি পর্য্যন্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের যতটা উন্নতি সাধন

করিয়াছেন, ইহার পূর্ব্বে তিন হাজার বৎসরেও হিন্দু রাজারা ততটা উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই ; এ কথা বলিলে যথার্থ কথাই বলা হয়।

তবে বিচক্ষণ লোক মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষের লোকদিগের মঙ্গলজনক অনেক কার্য্য গবর্ণমেণ্টের আরও করিতে আছে। রাজা যতই প্রজাবৎসল হউন না কেন, প্রজার মঙ্গল করিয়া শেষ করিতে পারেন না।

স্যর জন্ ষ্ট্রেচি বলিয়াছেন, অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষের সামাজিক, আর্থিক ও রাজনীতিক অবস্থার উন্নতি কল্পে যে আর কিছু করণীয় নাই, এ কথা বলা যায় না। অনেক বিষয়ের ত্রুটি সহজেই দেখাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এতটা উন্নতি না হইলে এই সকল ত্রুটি কাহারও চক্ষে ঠেকিত না।"

ঠিক কথা! অনেক বিষয়ের উন্নতি হওয়াতেই অন্য অনেক বিষয়ের ত্রুটি আমরা লক্ষ্য করিতে সক্ষম হইয়াছি।

এই অধ্যায়ের শেষভাগে যে প্রবন্ধের উল্লেখ করিলাম, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য বিষয়ের আলোচনায় ২০ পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে। এ যেন রাজার করণীয় গেল ; প্রজারও করণীয় আছে। প্রজার করণীয় রাজার করণীয় অপেক্ষা অধিক। রাজা শিব গড়িতে আরম্ভ করেন, কিন্তু প্রজার দোষে তাহা বানর হইয়া যায়। দেশের লোকের অভ্যাস ও সংস্কার এরূপ যে, গবর্ণমেণ্ট ভাল করিতে গেলে মন্দ হইয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট প্রজার সুখবৃদ্ধির জন্যে কোন কার্য্যারম্ভ করিলে প্রজার ত্রুটিতে তাহা লোকের অসুখবৃদ্ধির কারণ হইয়া উঠে। বাঙ্গালা সংবাদপত্রের কথায় কান দিও না। এই সকল কাগজের সম্পাদকেরা কেবল রাজ কর্ম্মচারিদিগের দোষ ধরিয়া বেড়ায়, এবং ইংরাজ ও ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব জন্মাইয়া দেয়। এত বড় রাজ্যটার শাসনকার্য্যে ভুল চুক হইবারই ত কথা ; সেই ভুল চুক ধরিয়া, তিলকে তাল করতঃ প্রজার মনে শাসনকর্ত্তাদিগের প্রতি বিদ্বেষ ভাব জন্মাইয়া দেওয়াতে দেশের বিস্তর অনিষ্ট হয়। মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ মাধব রাওয়ের যে উক্তি উপরে উদ্ধৃত করিলাম, তাহার অর্থ বুঝিয়া দেখ, তিনি সকল বিষয়ে আইন কর্ত্তাদিগের উপর নির্ভর করিতে পরামর্শ দেন না, আত্মসংশোধনের পরামর্শ দেন। কেবল রাজনীতিক বিষয়ে দিবারাত্র আলোচনা করিলে, যে সকল বিষয়ের সংশোধন করিলে দেশের বাস্তবিক মঙ্গল হইবে, সে সকল বিষয়ে লোকে মন দিবার অবকাশ পায় না। সামাজিক উন্নতি হইলে সকল বিষয়ের উন্নতি হইবে। অথচ লোকে লেখা পড়া শিখিয়াও সামাজিক কুসংস্কারের শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে সাহসি হইতেছে না। কতক গুলি দেশীয় কুপ্রথার অনুরোধে বিবাহে ও শ্রাদ্ধে ব্যয় বাহুল্য করিয়া বহু লোক পুরুষপুরুষানুক্রমে ঋণভার বহিয়া বেড়ায়। লোকের সংস্কার এই, বিবাহ উপলক্ষ্যে যে ঋণ হয়, তাহা শীঘ্র পরিশোধ হয়।

দেশের ধনবৃদ্ধিকর কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।—

দেশের দারিদ্র্য নিবারণের দ্বাদশটী উপায় আছে, লোকে ইচ্ছা করিলে আপনারাই সে গুলির অবলম্বন করিতে পারে।

১। ইংরাজি লেখা পড়া শিখিয়া সকলেই গবর্ণমেণ্টের চাকুরি, কেরাণীগিরি, এবং ওকালতী করিবার জন্য ব্যস্ত ; কিন্তু ইহা না করিয়া, কৃষিকার্য্যের, এবং শিল্পকার্য্যের উন্নতিচেষ্টা করা উচিত। ইহা করিলে আপনারাও ধনবান হইবেন, এবং দেশেরও মঙ্গল করিতে পারিবেন।

সরকারি কর্ম্ম করা অবিধেয় বলি না। তাহা করাতেও দেশের উপকার হয় ; কিন্তু সরকারি কার্য্যে যত লোকের দরকার, শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যখন তাহা অপেক্ষা অধিক হইয়াছে, তখন জীবিকা অর্জ্জনের জন্য উপায়ান্তরের অবলম্বন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ত ইহাদের চাই ; অথচ অর্থোপার্জ্জন বিনা তাহা হয় না।

মান্দ্রাজের জনৈক ইংরাজ বণিক কোন স্কুলের ছাত্রদিগকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা এই :—

"দেখ, তোমরা সরকারি কর্ম্ম করিয়া যে বেতন পাও, তাহা প্রজাদের দত্ত কর হইতে দেওয়া হয়, সুতরাং এই বেতন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে গেলে দেশের ধন ও সচ্ছলতা বৃদ্ধি করা হয় না। এ কথা কি কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ ?

এক্ষণে দেশের নানা স্থানে ইংরাজি স্কুল হওয়াতে অনেকেই লেখা পড়া শিখিতেছে, সকলেরই প্রধান লক্ষ্য সরকারি চাকুরি, এই সরকারি চাকুরির জন্য চারি লক্ষ লোকে লালায়িত, আবার ইহাদের সংখ্যা প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাইতেছে।

এক বার কোন বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে পুরস্কার দানকালে মাধব রাও বলিয়াছিলেন।—

"আজি কালি, কৃষক, তাঁতি, বণিক সিপাহি, শিল্পী, ব্রাহ্মণ, এমন কি, নাপিতেরা পর্য্যন্ত সকলেই সরকারি

চাকুরী, বা তদ্রূপ আর কোন সুখের চাকুরীর জন্য আপন আপন পুত্রসন্তানদিগকে প্রাণপণে লেখাপড়া শিখাইতেছে। এত লোকের চাকুরীর ব্যবস্থা করা গবর্ণমেণ্টের অসাধ্য।”

কয়েক বৎসর হইল, মান্দ্রাজের নর্টন সাহেবও যুবকদিগকে এই বিষয়ে সাবধান করিয়া দেন।—

“জীবিকানির্ব্বাহের নানা প্রকার সদুপায় থাকিতেও কেবল গবর্ণমেণ্ট চাকুরির উপর নির্ভর করা এদেশীয় জনসমাজের নিতান্ত অনিষ্টকর।”

গ্রাণ্ট ডফ যখন মান্দ্রাজের গবর্ণর ছিলেন, তখন তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে বলিয়াছিলেন,—

“ইংলণ্ডে যেরূপ হইয়াছে, এদেশেও তেমনি শিক্ষিত লোকদিগের দ্বারাই দক্ষিণ ভারত দারিদ্র্যরূপ কর্দ্দম হইতে উদ্ধার পাইবে।”

অনেকে না বুঝিয়া বলিয়া থাকেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট “জানিয়া শুনিয়া এদেশীয় শিল্প কার্য্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন।” আসল কথা এই, কাপড়ের কল হওয়াতে ইংলণ্ডে যেমন সে কেলে তাঁতিদিগের অন্ন মারা গিয়াছে, এদেশেও তাই হইয়াছে। জগতে সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার কল কারখানা হইতেছে, সুতরাং যাহারা হাতে তাঁত বুনিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত, তাহাদের ক্ষতি হইয়াছে। কলে অল্প সময়ে অধিক কাজ হয়। সুতরাং কলের কাপড় শস্তা। দিনের মধ্যে ১৬ ঘণ্টা হাতে তাঁত বুনিয়াও তাঁতিরা পেট ভরা অন্ন পাইতে পারে না। সুতরাং অনেকে জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসায় ধরিয়াছে। ঢাকা জিলার অনেক তাঁতি এখন কৃষিকার্য্য করিয়া খায়।

এ বিষয়ে বোম্বাই নিবাসী লোকদিগের বিলক্ষণ বুদ্ধি দেখিতে পাই, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের দোষ না দিয়া, কাপড়ের ও সূতার কল করিয়াছেন। এক্ষণে ভারতবর্ষে প্রস্তুত যত জিনিষ বিদেশে রপ্তানি হইতেছে, হিন্দু বা মুসলমান রাজত্ব কালে তত হইত না। ১৮৮৯–৯০ খ্রীঃ অব্দে আট কোটি সাতান্ন লক্ষ টাকা মূল্যের ভারতবর্ষীয় শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে; ১৮৮৩—৮৪ সালে কেবল চারি কোটি তেত্রিশ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানি হইয়াছিল। এক্ষণে আফ্রিকাখণ্ডের পূর্ব্বাঞ্চলে এবং চীন দেশে বোম্বাইয়ের কলের সূতা ও কাপড় বিলক্ষণ কাটিতেছে।

যত্ন ও টাকা থাকিলে কত উপকার হইতে পারে, বোম্বাইয়ের ধনীরা তাহার দৃষ্টান্ত।

২। এদেশের লোকে, অনেকে ইচ্ছা করিয়া, আবার অনেকে দায়ে পড়িয়া বিবাহে ও শ্রাদ্ধে বিস্তর অপব্যয় করিয়া থাকে। ইহা দরিদ্রতার এক প্রধান কারণ।

এ বিষয়ে মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর গ্রাণ্ট ডফ সাহেবের আর কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিতে হইল।—

“তোমাদিগের বিবাহে যে অপব্যয় হইয়া থাকে, ইউরোপীয়েরা তাহা শুনিয়া অবাক হয়েন। তোমাদিগের কেহ যদি এই অপব্যয় উঠাইয়া দেওয়াইতে পার, তাহা হইলে দক্ষিণ ভারতের এমন উপকার হইবে যে, কোন গবর্ণমেণ্ট দশ বৎসরেও তাহা করিতে সমর্থ হইবেন না।”

বঙ্গদেশে আজি কালি বিবাহের ব্যয় বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছে। কন্যাবিবাহ দিতে দিতে অনেকে যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইয়া বসিয়াছেন। অনেকে সাধ করিয়া অপব্যয় করেন সত্য; কিন্তু আজি কালি দায়ে পড়িয়া করিতে হইতেছে। যাহার টাকা আছে, তাহারই মেয়ের ভাল পাশ করা বর যোটে। এখন আর রূপগুণের দিকে বড় একটা দৃষ্টি নাই।

৩। টাকা ধারি করিবার আগে ভাবিয়া দেখিবে, পরিশোধ করিতে পারিবে কি না, এবং না পারিলে কি দুর্দ্দশা ঘটিবে।

ভারতবর্ষের অনেক লোক যেন নিতান্ত ছেলে মানুষ। তাহারা কেবল বর্ত্তমান কালের বিষয় ভাবে, ভবিষ্যৎ তাহাদের মনে ঠাঁই পায় না। ভবিষ্যতের দায় আদায়ের জন্য এক পয়সা জমা করে না। টাকার আবশ্যক হইলেই ধার করে। সুতরাং সুদ দিতে দিতে প্রাণ যায়। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করিলে আর দেনার ভারে কাহাকেও কাতর হইতে হয় না।

৪। স্বর্ণকারেরা অনর্থক টাকা খায়। লোকের বুদ্ধি থাকিলে এত দিনে তাহাদিগকে কামারের বা ছুতারের কাজ করিয়া খাইতে হইত।

১৮৯১ সালে ভারতবর্ষে ৪০১,৫৮২ জন স্বর্ণকার ও ৩৮৪,৯০৮ জন কামার ছিল। এক এক জন স্বর্ণকারের মাসিক আয় ৯৲ টাকা যদি ধর, তাহা হইলে দুই কোটি উন নব্বই লক্ষ টাকা হয়। বিলাতী সিবিলিয়ানের সংখ্যা মোটের মাথায় ১০০০। মান্দ্রাজের হিসাবে ইহাদের বার্ষিক বেতন ও ভাতা ধরিলে এক লক্ষ আশী হাজার টাকা হয়। ভারতবর্ষের লোকেরা প্রতি বৎসর গহনা গড়াইতে যে বানি বাটা দেন, সিবিল কর্ম্মচারীরা তাহার অর্দ্ধেকের কিছু বেশি পাইয়া থাকেন মাত্র।

এদেশের লাঙ্গল কোন কাজেরই নহে, এক গাছা বাঁকা লাঠিতে প্রায় এই লাঙ্গলের কাজ হইতে পারে। বুদ্ধি থাকিলে, লোকে ভাল ভাল লাঙ্গল তৈয়ার করিয়া, কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিত; তাহা হইলে স্বর্ণকারেরা গহনা না গড়িয়া লাঙ্গলের ফাল প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকিত। তাহাদেরও লাভ হইত, দেশেরও মঙ্গল হইত।

৫। যে সকল টাকা মাটীতে পোতা, বা গহনায় আট্‌কা রহিয়াছে, তাহা খাটাইলে দেশের ধনবৃদ্ধি হয়।

মিং নওরাজি ইংলণ্ডের কোন সভায় বলিয়াছিলেন, বিদেশী লোকের দ্বারা শাসনকার্য্য চালান হয় বলিয়া ভারতবর্ষের লোকে এক পয়সাও বাঁচাইতে পারে না। এ কথাও অমূলক। ১৮৮১ সাল হইতে ৮৪ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ২২ বাইশ কোটি সাতায় লক্ষ টাকার সোণা, আটত্রিশ কোটি সতের লক্ষ টাকার রূপা আমদানি হইয়াছে, মোট ৬০ কোটি। ইংলণ্ডে সোনা দিয়া গিনি ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। কিন্তু এ দেশে কি হয়?—লোকে সোনা কিনিয়া গহনা বানায়। যে রূপা আমদানি হয়, তাহারও অনেকটা ঐ কার্য্যে লাগিয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রতি বৎসর গহনা গড়াইতে এ দেশে দুই কোটি উননব্বই লক্ষ টাকা খরচ হইয়া থাকে। এই টাকা দিয়া যদি লোকে ব্যবসা বাণিজ্য করিত, কত লাভ হইত। এ দেশে মূল ধন পাওয়া যায় না। রেলওয়ে কোম্পানিরা লণ্ডনে টাকা তুলিয়া এ দেশে রেলরাস্তা করিতেছে, অথচ আমরা উক্ত রেলওয়ে কোম্পানি সকলের অংশীদারদিগকে সুদ যোগাইতেছি। আমাদের দেশের জমিদারেরা বিলাতী ধনিদিগের নিকট জমিদারী বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করিতেছেন। বিলাতী মূলধনের বলে আসামের অরণ্য আবাদ করিয়া চা-করেরা চা-বাগান করিয়া লাভ করিতেছে। মূলধনের অভাবই ভারতের অনিষ্টের একটী প্রধান কারণ। আমাদিগের অবিবেচনাই এই মূলধনাভাবের কারণ, শাসনকার্য্যে বিদেশী লোক নিয়োগ কারণ নহে।

আবার দেখ, এ দেশে সুদের হার বড় বেশি; টাকা ধার দিলে বিলক্ষণ সুদ পাওয়া যায়। কিন্তু গহনা গড়াইয়া রাখিলে সিকি পয়সাও লাভ হয় না, বরং ক্ষতি, আর চোর ডাকাইতের ভয়। টাকা ধার দিলে শতকরা বার্ষিক ১২ হইতে ৩৬ টাকা অনায়াসে পাওয়া যায়। কিন্তু গহনা গড়াইয়া রাখিলে কিছুই লাভ নাই।

কম হইলেও ২০০ শত কোটী টাকা গহনাতে ও মাটীর নীচে আবদ্ধ রহিয়াছে। শত করা বার্ষিক ১২ টাকা করিয়া সুদ ধরিলে, দেশের ভূমির রাজস্ব যত, তাহার অনেক অধিক টাকা হয়।

ফ্রাঙ্কলিন যথার্থ কথা বলিয়াছেন, "গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের নিকট হইতে যে কর লয়েন, সে জন্য আমরা কতই দুঃখ করিয়া থাকি, কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে, সরকারি কর দিতে যে টাকা যায়, আলস্য হেতু তাহার দ্বিগুণ, অহঙ্কার হেতু তাহার তিন গুণ, এবং মূর্খতা হেতু তাহার চারি গুণ টাকা খরচ হয়।"

৬। বিবাহের পূর্ব্বে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দেখা উচিত।

কুসংস্কার বশতঃ হিন্দুরা বিবাহ সংস্কারকে ধর্ম্ম কর্ম্মের মধ্যে গণ্য করে। পুত্র পিণ্ড দান না করিলে পরলোকে সদ্গতিলাভ হয় না। ইহাই লোকের বিশ্বাস। অপুত্রক ব্যক্তিরা মরিলে পর পুৎ নামক নরকে গিয়া থাকে। এই সংস্কারবশতঃ লোকে ধার কর্জ্জ করিয়াও বিবাহ করে।

হণ্টার সাহেব বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলের লোক যে এত দরিদ্র, তাহার কারণ ঘনবসতি, লোকে খরচ পত্রের বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা করে না। ইহারা সামান্য কৃষিজীবী; পরিবার প্রতিপালনের সংস্থান না করিয়াই বিবাহ করে, তাহাতেই লোকের সংখ্যা এত বেশি হইয়াছে যে, ভূমিতে যে শস্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে কুলায় না।"

৭। বিদেশে গিয়া বসবাস করা।

যদি উচ্চ প্রাচীর দিয়া খানিকটা জায়গা ঘিরিয়া, তাহার ভিতরে কতকগুলি খরগোস ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের সংখ্যা এত বাড়িবে যে শেষে অনাহারে মারা পড়িবে। দেওয়াল ভাঙ্গিয়া দিলে কি তাহারা সেই খানেই মাথা গুঁজিয়া থাকিবে? না; তাহাদের বুদ্ধি আছে, চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িবে; খরগোসের যে বুদ্ধি আছে, বিহার বিভাগের লোকের সে বুদ্ধি টুকুও নাই। পৈতৃক ভিটার মাটী কামড়াইয়া পড়িয়া থাকে, ছেলে পিলেকে দিনান্তে এক বারও পেটভরা আহার দিতে পারে না, তবু বুদ্ধিমান খরগোসের ন্যায় স্থানান্তর চলিয়া যাইবে না।

ইংলণ্ডের সমস্ত লোক যদি এ দেশের লোকের মত পূর্ব্বপুরুষের বাস্তুভূমির মায়ায় দেশেই থাকিত, নিশ্বাস ফেলিবারও স্থান পাইত না। ইংলণ্ডের অতিরিক্ত লোক আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি দেশে গিয়া বসবাস করিয়া সুখী ও বহুবংশ হইতেছে। দেশ ছাড়িয়া বিদেশে যাওয়াতে তাহাদের নিজের ও স্বদেশের, এই উভয়ের মঙ্গল হইতেছে। হিন্দুরা বিদেশে গেলেই হাতছাড়া হইবে, এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণেরা ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন যে, সাগর পারে গেলেই জাতি ধর্ম্ম নষ্ট হয়। এই কারণে এবং আরও অন্যান্য কারণে লোকে হাজার কষ্ট হইলেও স্থানান্তর যাইতে চাহে না।

হণ্টার সাহেব ইহার প্রতিবিধান বিষয়ে বলিয়াছেন, "লোকে যদি সমভাগে দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে, তাহা হইলে ভূমির উপরে লোকের ভরণপোষণভারও সমান ভাগে পড়ে। ভারতবর্ষের নানা অংশে বিস্তর উর্ব্বরা ভূমি আছে, যাহাতে আজিও লাঙ্গল পড়ে নাই। ঘনবসতি স্থান হইতে সরিয়া, অঘনবসতি স্থানে গিয়া বসতি করা ভারতবর্ষীয় কৃষকের উচি।"*

৮। জাতিভেদ সম্বন্ধীয় কুসংস্কার দূরীভূত করা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জাতিভেদ থাকাতেই হিন্দুরা বিদেশে গিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা ধনবৃদ্ধি করিতে পারে না। এ দেশের জিনিষ বিদেশীয়া বিদেশে লইয়া গিয়া বিক্রয় করতঃ লাভবান হইতেছে, অথচ এ দেশী লোকে তাহা করে না। এই জাতিভেদ হেতু চামড়া ইত্যাদি অতি লাভজনক ব্যবসায় হিন্দুর অকর্ত্তব্য করিয়া তুলিয়াছে।

৯। দেশাচারের লাঙ্গুল ধরিয়া না থাকিয়া, এবং গণকদিগের শুভাশুভ তিথি নক্ষত্র অনুসারে না চলিয়া বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তির চালনা করা আবশ্যক।

হিন্দুরা স্বভাবতঃ বড় বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী এবং উত্তম শিল্পী। কিন্তু "যা করেছি চিরকাল, তা করে কাটাব কাল," ইহাই তাহাদের মূলমন্ত্র। নিজের বুদ্ধি বিবেচনা না খাটাইয়া, গণক ও পঞ্জিকাকারদিগের কথামত চলে, শুভাশুভ দিনক্ষণ মানিয়া চলে, ইহাতেই ত এমন বুদ্ধিমান জাতির দরিদ্রতা ঘুচে না।

১০। অলসদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া ভাল নহে।

এ দেশে হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে ভিক্ষা ব্যবসায়ী লোক আছে। তাহারা জীবিকার্জ্জনের জন্য শ্রম করে না, কৃষিকার্য্যও করে না, কেবল ভিক্ষা করে। চৈতন্যের প্রসাদাৎ ভেকধারী বৈষ্ণব নামে যে সম্প্রদায় হইয়াছে, তাহারা ভিক্ষা করিয়া খায়, মুসলমানদিগের সমাজে "দেওয়ান সাহেবেরাও" ব্যবসায়ী ভিক্ষারী। ইহাদের অনেকে পৌষ মাঘ মাসে ভিক্ষা দ্বারা এত ধানের সংগ্রহ করে যে, সমগ্র বৎসর চাউলের ভাবনা ভাবিতে হয় না। হিন্দু মুসলমান উভয়ে অর্থ ও অন্ন দান দ্বারা ইহাদের ভরণ পোষণ করিয়া থাকেন। অন্ধ আতুরদিগকে দান করা ভাল, কিন্তু পরিশ্রম দ্বারা জীবিকার অর্জ্জন করা সবলকায় লোকের কর্ত্তব্য। ১৮৮১ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে ১২ লক্ষ ভিক্ষারী ছিল। ইহাদের অধিকাংশই ভিক্ষা ব্যবসায়ী। একান্নভুক্ত পরিবারে সুখও আছে, অসুখও আছে; এক ভাই উপার্জ্জন করেন, আর তিন ভাই দিবারাত্র তাস পেটেন আর অন্ন ধ্বংস করেন। এরূপ ঢের দেখিয়াছি। ইহাতে অলসতায় উৎসাহ দেওয়া হয়। সক্ষম ব্যক্তিমাত্রেই যদি জীবিকার্জ্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, তাহা হইলে দেশের দুরবস্থার একটী প্রধান কারণ তিরোহিত হয়।

১১। মদ ভাঙ্গ আফিম ইত্যাদি পরিত্যাগ করা উচিত।

মদ্যপান ইংলণ্ডের দরিদ্রতার এক প্রধান কারণ। লোকে যদি মদ না খাইত, ইংলণ্ড এক্ষণকার অপেক্ষাও ধনবতী হইত। সমগ্র ভারতবর্ষে বার্ষিক যে রাজস্ব আদায় হয়, ইংলণ্ডের লোকেরা তাহার প্রায় দ্বিগুণ টাকা মদে খরচ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে ১৮৭৪ সাল হইতে ১৮৯১ সালের মধ্যে আবকারি বিভাগের আয় আড়াই কোটি হইতে পাঁচ কোটি টাকা হইয়াছে। সুতরাং মদ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের জন্য লোকদিগের বার্ষিক সাত কোটি টাকা খরচ হইয়া থাকে। নেশা ছাড়িয়া দিলে এই টাকাটা ত বাঁচিতে পারে।

১২। "বল বল বাহুবল"।

সে কালে দুঃখ কষ্ট হইলে লোকে কপালের দোষ দিত। এ দেশীয় মুসলমানেরাও "কিস্মৎ" মানে। আমাদিগের সুশিক্ষিত সম্প্রদায় এক্ষণে আর কপালের বা কিস্মতের দোষ দেন না; এখন সব দোষ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের। অনাবৃষ্টি হেতু দেশে আকাল হইলে, সে দোষ গবর্ণমেণ্টের;—লোকে মাদক দ্রব্য সেবনে টাকা উড়াইয়া দেয়, সে দোষ গবর্ণমেণ্টের; লোকে ঋণ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হয়, সে দোষও গবর্ণমেণ্টের। লোকে যদি আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিয়া কেবল গবর্ণমেণ্টের দোষ দেয়, তাহাতে কোন সুফল হইবে না। দেশের উন্নতিকর সকল কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

নবাবী আমলে, বা রাজাদিগের আমলে, সর্ব্বদা যুদ্ধ চলিত, আকাল হইত, মারীভয় ইত্যাদি লোকপীড়ার নিতান্ত প্রাদুর্ভাব ছিল, তাহাতে দেশের লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইত না। অকালমৃত্যু হইতে লোকের জীবন এক্ষণে রক্ষিত হইতেছে বলিয়াই অনেক স্থলে জীবনান্নের জন্য লোকে এত আঁকু বাঁকু করিয়া বেড়ায়। দুইটী শ্রেণীর লোকের অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইবার সম্ভাবনা।

(ক) অর্দ্ধশিক্ষিত, চাকুরি কাঙ্গাল "ভদ্র লোকের" ছেলে।

বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য ভদ্র লোক বলিয়া গণ্য। ইহারা অনাহারে মারা গেলেও কায়িক পরিশ্রম করেন না। লাঙ্গলে হাত দিলে ইঁহাদের জাতি যায়। ইংরেজ, বা মুসলমান জুতাওয়ালার দোকানে ২০ টাকা

বেতনে কেরানিগিরি করিবে, তবু নিজে জুতার দোকান খুলিবে না। কি কুসংস্কার। এই তিন জাতির মধ্যে যাহারা অর্দ্ধশিক্ষিত, বা অশিক্ষিত, তাহারাও লেখাপড়ার কাজ করিতে চায়, অন্য কোন কাজ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে চাহে না। এই প্রকার লোকের দুঃখ ক্রমে বাড়িবে।

(খ) যাহারা অমিতব্যয়ী, তাহাদের ক্রমেই দুর্দ্দশা বাড়িবে।

এ দেশে অনেকে টেক্কা দিবার অভিপ্রায়ে বিবাহে, শ্রাদ্ধাদিতে ধার কর্জ্জ করিয়া অপরিমিত ব্যয় করে। ইহাতে করিয়া অনেক লোক অতি বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পল্লীগ্রামে গৃহস্থ কৃষকেরাই বিবাহাদিতে অত্যন্ত অপব্যয় করে। এই প্রকারে লোকে আমরণ ঋণভার বহিয়া কাতর হয়।

এ দিকে আবার যাহারা পরিশ্রমী এবং মিতব্যয়ী, তাহাদের অবস্থা ভাল হইয়া উঠিতেছে। ফলকথা এই, এক্ষণে ভারবর্ষীয় লোকের দরিদ্রতা অনেকটা দূর হইয়াছে, এবং হইতেছে। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে যে কৃষকেরা মাটীর পাত্রে ভাত খাইত, এক্ষণে পিতল কাঁসার বাসনের ভারে তাহাদের স্ত্রীদের কাঁকাল দরদ করে। কাঁচের চুড়ি যাহাদের গহনা মাত্র ছিল, এক্ষণে সেই সকল কৃষকনারীদের হাতে ও গলায় রূপার গহনা শোভা পাইতেছে। শীতকালে যাহারা কাঁথা গায়ে দিয়া বেড়াইত, এক্ষণে তাহারা বিলাতী র‍্যাপার গায়ে দেয়, তালপাতার মাতলা যাহাদের একমাত্র সম্বল ছিল, এক্ষণে তাহারা বিলাতী ছাতা কান্ধে ফেলিয়া কুটুম্ব বাড়ী যায়। এ সকল দরিদ্রতার লক্ষণ কি ?

ভারতবর্ষের ধর্ম্মবিষয়ক ইতিহাস।

স্বদেশপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই স্বদেশের ইতিহাস জানিতে চাহে। ভারতবর্ষে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, এখনও পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ক পরিবর্ত্তনগুলিই বিশেষ প্রয়োজনীয়। সেই সকলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতেছি।

আদিম নিবাসী।

এক সময়ে তুরাণী জাতীয় লোক এশিয়া খণ্ডের অধিকাংশ দেশে এবং ইউরোপের কতক অংশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, সেই তুরাণীয় পরিবারভুক্ত কোন কোন জাতীয় লোক এ দেশের অতি আদিম নিবাসী ছিল। আর্য্যদিগের এশিয়ায় ও ইউরোপে বিস্তৃত হইবার অনেক পূর্ব্বে তুরাণীয় লোকদিগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তাহারা ভূত প্রেতের পূজা দিত। ভূত প্রেতের সন্তোষ বিধানের জন্য পশু ও নরবলি দত্ত হইত। লোকেরা সুরাপান করিয়া ভূত দেবের সাক্ষাতে পাগলের ন্যায় নৃত্য করিত। দক্ষিণ ভারতের পাণ্ড্য (তামিল) জাতীয় লোকেরা আজিও এই প্রকার পূজানুষ্ঠান করিয়া থাকে। এই সকল ভূতের কতকগুলি কালক্রমে ভক্তবিশেষের হাতে পড়িয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং লোকে তাহাদিগকে দেবভাবে আরাধনা করে। দাক্ষিণাত্যের কৃষকেরা মাশোরা দেব বলিয়া, সিন্দুর মাখান একখণ্ড গোলাকার পাথরের পূজা করে। কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি অনুমান করেন যে, আদিনিবাসিরা শিবলিঙ্গেরও পূজা করিত। ইংরাজদিগের আগমনে যেমন এক্ষণে ভারতবর্ষে ফিরিঙ্গি নামে এক জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, আর্য্যদিগের আগমনেও তেমনি নানা বর্ণসঙ্কর জাতির উদ্ভব হয়, তাহাদের দ্বারা অনেক অনার্য্য দেবতার পূজা পরবর্ত্তী আর্য্যসমাজে প্রচলিত হইয়া পড়ে। ফলতঃ মহাদেব, কালী ইত্যাদি অনার্য্যদিগের দেবতা।

বৈদিক হিন্দু ধর্ম্ম।

তুরাণীয়দিগের পরেই, মধ্য এশিয়ার উচ্চ পর্ব্বতাবাস হইতে আসিয়া, আর্য্যজাতীয় লোকেরা ভারতবর্ষে বসতি করেন। বোধ হয়, আর্য্যদিগের পূর্ব্বে আর কোন জাতি আকাশবিহারী চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ-নক্ষত্রগণকে দেবকল্পনা করিয়া পূজা করে নাই। এই সকল হইতে উপকার প্রাপ্ত হইত বলিয়া, সৃষ্টিকর্ত্তার পরিবর্ত্তে এই সকলের আরাধনা করিত। ইহার পরে অগ্নি, বায়ু, বরুণ ইত্যাদিরও পূজা প্রচলিত হয়।

অতি প্রথমে ভারতবর্ষে যে আর্য্যেরা আসিয়া বসতি স্থাপন করেন, ঋগ্বেদের স্তোত্র বা ব্রাহ্মণ আলোচনা করিলে, তাঁহারা কি প্রকার ধর্ম্ম মানিতেন, তাহা জানিতে পারা যায়। ঋগ্বেদ এক জনের দ্বারা, বা এক সময়ে রচিত হয় নাই; ঠিক বাইবেল শাস্ত্রের মত, নানা সময়ে, ও নানা জনের দ্বারা লিখিত হইয়াছে, কিন্তু পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, খ্রীষ্টের ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে সংকলিত হয়। এ স্থলে একটী কথা মনে রাখা উচিত; যৎকালে আর্য্য হিন্দুরা লিখিতে জানিতেন না, তাহার অনেক পূর্ব্বে ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ সকল রচিত হয়। ঋগ্বেদ মতে ইন্দ্র

দেবগণের রাজা। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের স্তোত্রই বেশি, তিনিই বিমানের অধিপতি, বজ্রপাণি, তাঁহারই বজ্রাঘাতে মেঘমালা বিদীর্ণ হইয়া বৃষ্টিপাত হয়, ও পৃথিবীকে উর্ব্বরা করে। ইন্দ্রের পরেই অগ্নি। দেবগণের নামে যাহা কিছু উৎসৃষ্ট হয়, অগ্নির মারফতে সে সমস্ত তাঁহাদের নিকটে পঁহুছে। বরুণ জলের দেবতা। চন্দ্র, সূর্য্য উষা ইত্যাদি আরও বিস্তর দেবতার আরাধনা প্রচলিত ছিল। সর্ব্বসমেত ৩৩টী দেবদেবী। নিম্নে বেদের কয়েকটী স্তোত্র উদ্ধৃত করা গেল।

"হে ইন্দ্র, তুমি অশ্বদান কর, গোদান কর, যবাদি ধান্য দান কর।"

"হে ইন্দ্র, এই দীপ্ত হব্যসমূহ ও এই সোমরস সমূহে তুষ্ট হইয়া গো এবং অশ্বযুক্ত ধনদান করিয়া আমাদিগের দারিদ্র্য দূর করিয়া প্রসন্নমনা হও!"

তৎকালের হিন্দুরা সোমরস নামে এক প্রকার সুরার ব্যবহার করিতেন। সোমরস বিনা দেবার্চ্চনা হইত না। কথিত আছে যে, এই সোমরস পানে মত্ত হইয়া কৃষ্ণের সন্তানেরা যুদ্ধ করিয়া হত হয়। কিন্তু শেষে এই দেবাকাঙ্ক্ষিত সোমরসের অনিষ্টকারিতা দেখিয়া হিন্দু রাজারা সোমলতার চাষ পর্য্যন্ত তুলিয়া দেন। এক্ষণে ভারতবর্ষের কোন অংশে সোমলতা নাই, যদি থাকে, লোকে চিনে না।

সাধারণ হিন্দুরা বেদের বিষয় কিছুই জানে না। সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে, সম্পূর্ণ আকারে চারি বেদ ব্রহ্মার চারি মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে। বাঙ্গালা মহাভারতে যেমন "কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান" ইত্যাদি ভুনাতি আছে, বেদের অনেক শ্লোকেও রচকের নামের সেই রূপ ভুনাতি আছে। সে কালের, এবং এ কালেরও হিন্দু গ্রন্থকারেরা যেমন কাব্য রচনা কালে দেবতাদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন, এবং করিয়া থাকেন, বেদের স্তোত্র রচকেরাও তাই করিতেন।

বৈদিক ধর্ম্ম আর বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ; বেদে দেবতাদের সংখ্যা ৩৩, কিন্তু এ কালে তাঁহাদের এত বংশবৃদ্ধি হইয়াছে যে, এক্ষণে হিন্দুদিগকে তেত্রিশ কোটি দেবতা মানিতে হয়। শিব, দুর্গা, কালী, রাম ও কৃষ্ণ, এ সকল নাম বেদে নাই। অথচ আজি কালি শিব, কালী ও কৃষ্ণই প্রধান উপাস্য দেবতা। বৈদিক সময়ে যে প্রতিমাপূজা হইত, তাহারও প্রমাণ নাই। জন্মজন্মান্তরের কথাও বেদে নাই। তখন ব্রাহ্মণ বলিয়া কোন জাতি ছিল না, ব্যবসায় ছিল। গুণবলে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারিত, তাহার সাক্ষী বিশ্বামিত্র মুনি। বৈদিক কালে জাত্যংশে ব্রাহ্মণেরা আর সকলের সমান ছিলেন।

জাতির বিষয়।—বৈদিক সময়ের অব্যবহিত পর হইতে কয়েক শত বৎসর কাল হিন্দুধর্ম্মের কিরূপ অবস্থা ছিল, তদ্বিষয়ে কিছুই জানা যায় না, জানিবার উপায়ও নাই। মনুসঙ্কলিত ব্যবস্থা পাঠে দেখা যায় যে, তৎকালে ব্রাহ্মণেরা জাতিভেদটা বিলক্ষণ পাকাইয়া তুলিয়াছিলেন। বৈদিক সময়ে লিখন প্রণালীর উদ্ভব হয় নাই, সুতরাং যজ্ঞকালে যে সকল মন্ত্রের উচ্চারণ করিতে হইত, সে সকল মুখস্থ করিতে অনেক সময় লাগিত। ব্রাহ্মণেরা এই কার্য্যে ব্রতি ছিলেন, সুতরাং অন্য লোকের অপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্য হয়েন। লোকেও তাঁহাদিগের সম্মান করিত, কালক্রমে তাঁহারা "ভূদেব" হইয়া পড়েন। কথিত আছে যে কেবল বিপ্রসেবার জন্যই শূদ্রের সৃষ্টি।

বৌদ্ধধর্ম্ম।—খ্রীষ্ট জন্মের ন্যূনাধিক ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের স্থাপনকর্ত্তা শাক্যমুনি আবির্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করেন। মগধ দেশের রাজা অশোকের যত্নে শাক্যপ্রণীত ধর্ম্মমত ভারতবর্ষে কিছু কাল বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়া পড়ে। হিন্দুদিগের পুণ্যক্ষেত্র বারাণসী ধাম কয়েক শত বৎসরকাল বৌদ্ধদিগের প্রধান আড্ডা ছিল। বহুকাল পরে শঙ্করাচার্য্য নামক জনৈক প্রতীভাশালী পণ্ডিত নানা গ্রন্থ লিখিয়া পুনরায় শৈবধর্ম্মের স্থাপন করেন; এবং হিন্দু রাজাদিগের চেষ্টায় শেষে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে তাড়িত হইয়া সিংহলে গিয়া আশ্রয় লয়। তথাপি ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে কতক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোক আছে।

আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম।—কালক্রমে বৈদিক দেবতাদের প্রতি লোকের আদর কমিয়া যায়, এবং নূতন নূতন দেবতার আবিষ্কার হয়। খ্রীষ্ট জন্মের ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে শিবের আরাধনা হইত। খ্রীষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়। স্থানীয় অভিনব দেবতাগুলির উপাসনা হইতে লোকদিগকে বিরত করা কঠিন ব্যাপার দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা সে গুলিকে "অমুক অমুকের অবতার, অমুক অমুকের নামান্তর" বলিয়া আপনাদিগের আরাধ্য দেবতাদের শ্রেণীভুক্ত করিয়া লয়েন। রাম ও কৃষ্ণকে গ্রন্থকারেরা বীররূপে বর্ণন করিয়া যান, শেষে লোকে এই দুই জনকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া আরাধনা করিতে আরম্ভ করে। এখনও রাম ও কৃষ্ণ ঐ রূপে পূজিত, তবে বঙ্গদেশে রামের পূজা হয় না।

পুরাণ।—দেবতাবিশেষের মহিমা কীর্ত্তনার্থই পুরাণের সৃষ্টি। অতি প্রাচীন পুরাণও খ্রীষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত হয় নাই। আবার অনেক পুরাণ তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

এক্ষণে ভারতবর্ষের উত্তরাংশে বিষ্ণুর উপাসকের সংখ্যা বিস্তর। মান্দ্রাজীরা শিবভক্ত, বাঙ্গালিরা দুর্গাভক্ত, বঙ্গদেশে জৈন, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ই আছে। বোধ হয়, বৈষ্ণবতন্ত্রীই অধিক।

মুসলমান ধর্ম্ম।—আরবেরা আসিয়া ভারতবর্ষে অনেক বার লুট পাট করিলেও স্থায়ী হয় নাই। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে ঘজনির মহম্মদ আসিয়া দেশটী অধিকৃত করেন। কালক্রমে মুসলমানেরা সমস্ত ভারতবর্ষেরই অধিপতি হইয়া পড়ে। কোন কোন মুসলমান বাদশা স্বধর্ম্ম প্রচারার্থে বড় যত্নশীল ছিলেন। আরঙ্গজিব অনেক সময়ে হিন্দুদিগকে ধরিয়া আনিয়া ত্বকছেদ করাইয়া দিতেন; কাশীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দির ভূমিসাৎ করত, তৎস্থলে এক মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। হিন্দুদিগকে জিজিয়া নামে কর দিতে হইত, কিন্তু মুসলমানদিগকে দিতে হইত না। মুসলমানদিগের আরও অনেক সুবিধা ছিল। এই সকল সুবিধা দেখিয়া অনেকে ইচ্ছাপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিত। পূর্ব্ব বাঙ্গালার ৸৵ আনা নিবাসী মুসলমান। সিন্ধুনদের তীরেও বিস্তর মুসলমান; কিন্তু দক্ষিণ ভারতে মুসলমান বড় কম।

খ্রীষ্টধর্ম্ম।—খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে মিসর দেশে শিকন্দরিয়া নগরের তুল্য বাণিজ্য নগর ধরাতলে আর ছিল না। মার্ক নামক সুসমাচার লেখক এই নগরে একটী স্কুল স্থাপিত করিয়া ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে শিক্ষা দিতেন। ভারতবর্ষীয় বণিকেরা জাহাজে করিয়া রেশম ও মুক্তা ইত্যাদি বহুমূল্য দ্রব্য বিক্রয়ার্থ মিসর দেশে যাইত। তাহাদের কেহ কেহ তথায় শুনিয়াছিল যে, জগতে ত্রাণকর্ত্তার আগমন হইয়াছিল। দ্বিতীয় শতাব্দীর আরম্ভে ভারতবর্ষীয় লোকেরা শিকন্দরিয়ার বিশপের কাছে খ্রীষ্টীয়ান শিক্ষক চাহিয়া পাঠায়। তদনুসারে পন্তিনুঃ নামে এক অতি পণ্ডিত ব্যক্তিকে উক্ত বিশপ পাঠাইয়া দেন। যত দূর জানা যায়, তাহাতে বোধ হয়, তিনিই ভারতবর্ষে আগত প্রথম মিশনরি। প্রাচীন মিস্‌র দেশে বিদ্যা বুদ্ধি, বল ও পরিশ্রমের অভ্যাস ও চর্চ্চা ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। গ্রীস্‌, রোম, বাবিল, অসরিয়া ফৈনিকীয়া এবং পারস্য দেশবাসীগণের জাতীয় জীবন দিন দিন নির্জ্জীব হইয়া পড়িতেছে। চীন দেশের তো কথাই নাই। ভারতবর্ষও কিছু কাল জ্ঞানের চর্চ্চ করিয়া শেষে ধ্বংস ও অধোগতির দিকে দৌড়িয়াছে। মুসলমানদিগকে আর উন্নত অবস্থা লাভ করিতে দেখা যায় না। আজকাল কেহই বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রহণ করিতেছে না; সুতরাং ইহার আর উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় না।

মনুষ্যজাতির ইতিহাসের সত্য ঘটনা সকল চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, খ্রীষ্টধর্ম্ম ও খ্রীষ্টীয় রাজত্বই মনুষ্য জাতির উন্নতি সংবর্দ্ধন করিবার প্রশস্ত পথ। ইহার প্রমাণ এই যে, যে জাতির লোকেরা খ্রীষ্টীয়ান, তাহারাই দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আর সকলের অধোগতি হইতেছে।

খ্রীষ্টীয়ানেরাই আজকাল পৃথিবীর মধ্যে ধনবান ও বিদ্বান বলিয়া বিখ্যাত। বিজ্ঞান, দর্শন ও ভাষায় ইহাদের মত আর কেহই উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। টেলিগ্রাফ, কল, রেলের গাড়ি এবং ফটোগ্রাফ প্রভৃতি বিষয়গুলি কাহারা আবিষ্কার করিয়াছেন? খ্রীষ্টীয়ান ব্যতীত জগতের মধ্যে আর কোন্ জাতিব্যবসা ও বাণিজ্যে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে?

আবার বলি, খ্রীষ্টীয়ান ব্যতীত আর কোন্ জাতি এ রূপ সুশৃঙ্খল ও সুচারুরূপে রাজ্যপালন এবং রাজনীতি বিষয়ে উন্নতিলাভ করিয়া প্রজার সুখবৃদ্ধি ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে? প্রজাদিগের দুঃখ ও কষ্ট দূর করিয়া তাহাদিগকে সুখী করিবার জন্য কোন্ রাজা এত চেষ্টা করিয়া থাকে?

বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, খ্রীষ্টীয়ানগণই পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বিদ্যা, বুদ্ধি, বল ও কৌশলে দিন দিন অধিকতর উন্নতিলাভ করিতেছে; কিন্তু আর আর সকলে এক স্থানেই পড়িয়া রহিয়াছে। ইহারাই আজ কাল সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, এবং অন্যান্য বিদ্যার বিশেষ চর্চ্চা করিতেছে। ইহার কারণ এই যে, খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস ও ধর্ম্মশাস্ত্রের জ্ঞান ইহাদিগের মনে রহিয়াছে।

আবার জিজ্ঞাসা করি, এমন সুধারা ও সুনিয়মে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক নিয়ম স্থাপন করিয়া, এবং দিন দিন নূতন নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়া মনুষ্য জাতির সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি কল্পে আর কাহারা এরূপ চেষ্টা করিয়া থাকে?

পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগণ এখন সভ্যতার ধাপে উঠিয়াও একই স্থানে দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু খ্রীষ্টীয়ানগণ ধনে মানে, বিদ্যা বুদ্ধি কৌশল ও পরাক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া দিন দিন ব্যবসা ও বাণিজের শ্রীবৃদ্ধি, নূতন নূতন বিষয় সকল আবিষ্কার করিতেছে।"

মন্ত্রিবর গ্লাড্‌ষ্টোন বলেন, "গত পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম সভ্যতা ও উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়া মনুষ্য জাতির গৌরবের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছে।"

খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের দ্বারাই লোকে সভ্যতার উচ্চতম সোপানে উঠিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের আদর্শ ও উদাহরণাদি দেখিতে পায়। এই ধর্ম্মের দ্বারাই লোকে পাপের ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া পাপ ও শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করণার্থ বল পায়।

খ্রীষ্টীয়ানদিগের মধ্যে অনেক নামধারী খ্রীষ্টীয়ান আছে, সত্য। লাটিন ভাষায় একটি প্রবাদ আছে, "ধার্ম্মিক

লোকের বিনাশে দুষ্ট লোকের বৃদ্ধি হয়।" লোকে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের শিক্ষানুসারে না চলিলে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম যে মন্দ, এ কথা বলিতে পারা যায় না।

ভারতবর্ষের ভাবী দশা।—সহস্র সহস্র বৎসর গত হইল, হিন্দু আর্য্যদিগের এবং ইউরোপের প্রধান জাতিগণের পূর্ব্বপুরুষেরা মধ্য এশিয়ার উচ্চ ভূমিতে একত্র বাস করিত, এক ভাষায় কথা বলিত, এবং এক স্বর্গস্থ পিতার আরাধনা করিত।

পরে ঐ স্থান হইতে যাহারা পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে গমন করিয়াছিল, তাহারা সকলেই এক ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দেবদেবীর পূজা করিতে শিখিয়াছিল। হিন্দুরা ৩৩ কোটী দেবদেবীর উপাসনা করে। প্রাচীন কালে আথীনি নগর ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। লোকে বলে, সেই সময়ে ঐ দেশে কেবলই বিগ্রহ, মানুষ খুঁজিয়া পাওয়া ভার হইত। ইউরোপের পুরাতন দেবগণ ভারতবর্ষের দেবতাদিগের ন্যায় সর্ব্বদাই পরস্পর ঝগড়া ও বিবাদ করিত। শিব, কৃষ্ণের ন্যায় তাহারাও ব্যভিচার ও নরহত্যা করিত।

ইউরোপের প্রথম খ্রীষ্টীয়ান পুরোহিতের নাম পৌল; ইনি যখন ক্ষুদ্র এশিয়ার তার্স নগরে বাস করিতেন, আথীনিবাসীগণ সেই সময়ে ইউরোপের মধ্যে প্রধান ও সমৃদ্ধিশালী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। পৌল তাহাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা হইল ;—

"বিশেষতঃ বেড়াইবার সময়ে তোমাদের পূজ্যবস্তু সকল নিরীক্ষণ করিয়া এক যজ্ঞবেদিও দেখিলাম, তাহার উপরে 'অবিদিত ঈশ্বরের উদ্দেশে,' এই কথা লিখিত ছিল। অতএব, তোমরা না জানিয়া যাঁহার ভজনা করিতেছ, তাঁহার কথা আমি তোমাদিগের নিকট প্রচার করি। জগতের ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা যে ঈশ্বর, তিনি স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভু আছেন বলিয়া হস্তকৃত প্রাসাদে বাস করেন না; এবং কোন কিছুর অভাব প্রযুক্ত মনুষ্যদের হস্ত দ্বারা সেবিত হইবার অপেক্ষা করেন না; কেননা তিনি আপনি সকলকে জীবন ও শ্বাস প্রভৃতি সকলই দিতেছেন। আর তিনি এক রক্ত হইতে মনুষ্যদের যাবতীয় জাতি উৎপন্ন করিয়া সমস্ত ভূমণ্ডলে বাস করাইয়া তাহাদিগের নিবাসের নিরূপিত কাল ও সীমা স্থির করিয়াছেন, তাহারা যেন ঈশ্বরের অন্বেষণ করত হাঁতড়াইয়া হাঁতড়াইয়া কোন মতে তাঁহার উদ্দেশ পায়। তথাপি তিনি আমাদিগের কাহারও হইতে দূরে আছেন, তাহা নহে, বস্তুতঃ তাঁহাতেই আমাদিগের জীবন ও গতি ও সত্তা হইতেছে; যেমন, তোমাদের কয়েক জন কবিও কহিয়াছে, যথা, 'আমরাও তাঁহার বংশ।' ভাল, আমরা যদি ঈশ্বরের বংশ হই, তবে ঈশ্বরের স্বরূপকে মনুষ্যের কৌশল ও চিন্তানুসারে খোদিত স্বর্ণের কি রৌপ্যের কি প্রস্তরের সদৃশ জ্ঞান করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে। আর ঈশ্বর সেই অজ্ঞানতার কাল উপেক্ষা করিয়া এখন সর্ব্বস্থানের সর্ব্বমনুষ্যকে মন পরিবর্ত্তন করিতে আজ্ঞা দিতেছেন।"

আঠার শত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য যে প্রকার আয়োজন হইয়াছিল, সম্প্রতি ভারতবর্ষেও তদ্রূপ আয়োজন হইতেছে।

রোম রাজ্যের প্রাদুর্ভাবে ভূমধ্য সাগরের তীরবর্ত্তী দেশ সকলের মধ্যে মিশনরিগণ অনায়াসে যাতায়াত করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। রোমের প্রত্যেক রাজপথে প্রচারকগণ সুসমাচার প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। প্রায় সকল দেশের লোকে, ন্যূনাধিক পরিমাণে গ্রীক ভাষা বুঝিতে পারিত। রোমের উদ্যোগে এই বিশ্বব্যাপী আত্মিক সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে খ্রীষ্টের রাজ্য স্থাপন করিবার জন্য অনেক প্রকার বন্দোবস্ত হইতেছে। পূর্ব্বে এই দেশ ক্ষুদ্র ২ উপরাজ্যে বিভক্ত ছিল। সর্ব্বদাই রাজায় রাজায় লড়াই ও হাঙ্গামা হইত। এই হেতু এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাইবার সুবিধা ছিল না। আজ কাল রাস্তা, রেলের গাড়ী, এবং ষ্টীমার প্রভৃতি হওয়াতে সে প্রকার অসুবিধা আর নাই। হিমালয় পর্ব্বতের শিখর দেশ হইতে কুমারিকা অন্তরীপের উপকূল পর্য্যন্ত লোকে অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারে। আবার, ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকে এখন ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিতেছে; সুতরাং তাহাদিগের নিকট খ্রীষ্টের ধর্ম্ম প্রচার করা বড়ই সহজ হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ মোক্ষ মুলার বলেন, ভারতবাসীদিগের মনে পূর্ব্বে জাতীয় উদার ভাব ছিল না। স্বজাতি ব্যতীত পর জাতির উপর তাহাদিগের সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া যাইত না। আজ কাল উচ্চ-শিক্ষা প্রাপ্ত লোকদিগের মধ্যে সে ভাব আর দেখিতে পাওয়া যায় না। জাতীয় কংগ্রেসের মাহাত্ম্যে দেশ দেশান্তর হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ও ধর্ম্মাবলম্বী লোক একত্র হইয়া উদ্যোগের সহিত কার্য্য করিতেছে।

আর একটী বিষয় সম্বন্ধে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের সমতুল হইয়াছে। ইউরোপে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইবার বিষয়ে ও সি, লায়ল মহোদয় বলেন, "যেমন জালপূর্ণ মাছ জল হইতে তুলিলেই সূর্য্যের আলোকে ও বাতাসে মরিয়া যায়, তদ্রূপ উন্নত জ্ঞানালোকের প্রাদুর্ভাবে হিন্দুদিগের দেবদেবী সকল মরিয়া যাইবে। এই অভিপ্রায়ে হিন্দু সমাজ সংস্কার করা হইতেছে।"

পুরাকালে রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে দেব পূজার সমূল উচ্ছেদ হওয়া সম্বন্ধে অধ্যক্ষ কেরন্স বলেন, "ইফ্রাতা নদীর তীর হইতে ব্রিটনের উপকূল পর্য্যন্ত এবং নীল নদীর ধার হইতে জর্ম্মণির জঙ্গলের কিনারা পর্য্যন্ত এই চতুঃসীমার মধ্যস্থিত দেশবাসীদিগের মধ্যে আর দেবপূজা প্রচলিত নাই। ভূমধ্য-সাগরের তীরবর্ত্তী দেশবাসীগণ এখন সভ্য হইয়া দেবপূজা ছাড়িয়া সত্য ঈশ্বরকে গ্রহণ করিয়াছে। গ্রীস্, রোম, সিরিয়া, মিসর এবং উত্তর আফ্রিকা দেশবাসীগণের সে কেলে দেবতার প্রাদুর্ভাব আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সম্প্রতি দিয়ানা দেবী, সিরাফিস্, ব্যালদেব, অর কিম্বা ওডেন প্রভৃতির উপাসক আর নাই।"

যাহাতে ভারতবর্ষ হইতে দেবদেবীর নাম সমূলে উচ্ছেদ হইয়া যায়, এই হেতু অনেক প্রকার আয়োজন হইতেছে। "যে দেবতাগণ স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করে নাই," তাহারা স্বর্গের নীচে এই পৃথিবীতে ধ্বংস হইয়া যাইবে। ভারতবাসীগণ আপনাদিগের দেবদেবীদিগণকে ছুঁচোর গর্ত্তে অথবা চাম্‌চিকার বাসায় ফেলিয়া দিয়া আর তাহাদিগের পূজা করিবে না। ইউরোপের মিনার্ভা এবং জুপিতরের ন্যায় ভারতবর্ষের বিষ্ণু ও শিবের মন্দির সকল জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইবে। তাহাদিগের উপাসক আর কেহই থাকিবে না। পৃথিবীর সকল জাতি পরস্পর ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া একত্র এক মনে সেই একমাত্র ঈশ্বরের পদতলে পড়িয়া বলিবে, "হে **আমাদের** স্বর্গস্থ পিতঃ তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক" ইত্যাদি।

আজ কাল ভারতবর্ষের উপকার জন্য যে প্রকার যত্ন হইতেছে, ইতিপূর্ব্বে কেহই তদ্রূপ করে নাই। ভারতবাসীগণ যেন মনে করিয়া রাখে যে, তাহাদের দেশের সমাজ সংস্কার করা নিতান্ত প্রয়োজন; কেননা সমাজের উন্নতি হইলেই অন্যান্য অভাব ক্রমশঃ দূর হইয়া যাইবে। চলিত কথায় বলে, "যেমন গুরু তেমনি চেলা," সুতরাং ভারতবাসীগণ দেবপূজা ত্যাগ না করিলে কোন মতে সভ্যতম জাতির শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবে না। সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে আমাদিগের যে পুস্তকগুলি আছে, তাহা পাঠ করিলে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও অভাব জাত হওয়া যায়।

জাতিবিচার ভারতবর্ষের পুরাতন জাতীয় ধর্ম্ম। আজ কাল জাত্যভিমানের পরিবর্ত্তে জাতীয় প্রথা বা পদ্ধতির প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। এই সম্বন্ধে স্যর মাধব রাও মহাশয়ের কথাগুলি মনে করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। যাহা সত্য নহে, তাহাতে দেশ হিতৈষীভাব কখনই থাকিতে পারে না। তিনি বলেন;—

খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মই প্রকৃত সত্য। পৃথিবীবাসী সকলেরই এই ধর্ম্ম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এই ধর্ম্মের মাহাত্ম্যে কুসংস্কার নষ্ট হইয়া যায় এবং সকল জাতীয় লোকে ভ্রাতৃভাবে এক বন্ধনে মিলিত হইয়া থাকে। ইহাই বিশুদ্ধ আত্মিক ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের প্রভাবে জাতি-গৌরব, মান ও অভিমান ত্যাগ করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের বক্ষে সকলে একত্র স্থান প্রাপ্ত হয়।

সমাপ্ত
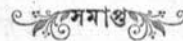
"হে ঈশ্বর, তুমি সকল জাতিকে একই রক্ত হইতে সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীতে বাস করিতে দিয়াছ; এবং নিকটস্থ ও দূরস্থ লোকদিগের নিকট শান্তি প্রচারার্থে আপন ধন্য পুত্রকে প্রেরণ করিয়াছ। আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই দেশের সমস্ত লোকে তোমাকে অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হয়। আর বিনয় করি, হে স্বর্গস্থ পিতঃ, তাবৎ মনুষ্যের উপর আপন আত্মা বর্ষণের অঙ্গীকার ত্বরায় পরিপূর্ণ কর। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুরোধে এই প্রার্থনা শ্রবণ কর। আমেন্।"